

ঝুমরি

মায়া ঘোষদস্তিদার



ঝুমরি

মায়া ঘোষদস্তিদার

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৩৮৫
ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯
প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং হাউস
২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ২৯
প্রচ্ছদপট
গৌতম রায়
মুদ্রাকর
পি. কে. পাল
শ্রীসারদা প্রেস
৬৫ কেশব সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৯

পাঁচ টাকা

ছোড়দিকে

ঝুমরি

আমি তখন খুব ছোট্ট ছিলাম। ঝুমরি নামে একটা ছোট্ট সাঁওতালদের মেয়ের সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। ঝুমরি দেখতে ফুটফুটে সুন্দর ছিল না, ছিল কুচকুচে কালো। তা হোক, তবু দেখতে ঝুমরি ভারি মিষ্টি ছিল। চোখ দুটো ছিল কালো ভোমরার মতো, চুলগুলো ছিল থোকা থোকা ঝুমকো জবার মতো। বেশির ভাগ সময়ই চুলের গোছাতে ঢাকা থাকত একটা চোখ। মুখে হাসি লেগেই থাকত। পরনে থাকত হলদে ছোট্ট একটা শাড়ি, হাতে রূপোর কাঁকন, আর কালো পায়ে থাকত রূপোর মল। ঝুমরি ঝুমুর ঝুমুর মল বাজিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াত মাঠে জঙ্গলে।

আমার ওকে ভারি ভাল লাগত। সারাদিন ঝুমরিটা ঘুরে ঘুরে বেড়াত, কেউ ওকে মানা করত না। আমার ভারি ইচ্ছে হত ওর মতো স্বাধীনভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াই, ওরই মতো ঝুমুর ঝুমুর করে মল বাজিয়ে বাজিয়ে। ইচ্ছে হত ওর সঙ্গে ভাব করি। কিন্তু সুযোগ পেতাম না একদিনও। ছেলেবেলায় আমরা থাকতাম সাঁওতাল পরগনার সুন্দর ছোট্ট শহর গিরিডিতে। সেই দেশে সারাদিন আমরা অনেক সাঁওতাল মেয়ে পুরুষ দেখতাম। তা ছাড়া আমার বাবার ছিল অভ্রের ব্যবসা, সেই উপলক্ষে আমাদের অভ্রের গুদামে কাজ করতে আসত অনেক সাঁওতাল মেয়ে পুরুষ, ওদের কারো কারো সঙ্গে আসত ছোট ছেলে মেয়েরা। ঝুমরি আর ওর ছোট ভাই বুধনটা আসত ওদের মা রাঙ্গিয়া আর বাবা আলন মাঝির সঙ্গে। আমাদের ইঁদারার পাশে মস্ত বড় ঝাঁকড়া মহুয়া গাছটার ছায়ায় বসে বসে ঝুমরি ওর ভাই-এর সঙ্গে খেলা করত। কখনও বসে বসে হলুদ বুনো ফুল জড়িয়ে জড়িয়ে মালা

গাঁথত। ভাবতাম, ওর কি মজা! সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত শুধু খেলা আর খেলা। পড়াশোনার বালাই নেই। আমার পড়ার ঘরের জানলা দিয়ে ইঁদারার পাড়টা খুব ভাল করে দেখা যেত। আমি পড়ার ফাঁকে ফাঁকে ঝুমরিটাকে দেখতাম। ওকে দেখতে খুব ভাল লাগত। একদিন ওর সঙ্গে ভাব করেই ফেললাম।

সেদিন ছিল রবিবার, কুলি-কামিনদের মাইনে নেওয়ার দিন, প্রতি রবিবার দিন ওরা মাইনে পেত। সেদিনও এসেছিল কুড়ি-পঁচিশ জন সাঁওতাল মেয়ে-পুরুষ, জড়ো হয়েছিল বাড়ির সামনের বড় মাঠটায়। বাবা সবে মস্ত একটা নামের খাতা নিয়ে চেয়ারে বসেছেন কুলিদের নাম ডাকতে, আর আমাদের দরোয়ান পিয়ারীয়া বাবার সামনে রাখা টেবিলটার উপর দড়ির থলে থেকে হুড় হুড় করে টাকা পয়সা ঢালছে, এখুনি মাইনে দেওয়া শুরু হবে। এই ফাঁকে সুট করে আমি গিয়ে হাজির হলাম মহুয়াতলায়, যেখানে ঝুমরি বসে ঘাংড়া (বরবটির মতো) খাচ্ছিল। আমি গিয়ে ওর সামনে দাঁড়াতেই ও আমার দিকে চেয়ে ফিক্ করে হেসে ফেলল, ব্যস্ আমাদের মধ্যে ভাব হয়ে গেল।

ঝুমরি থাকত খাণ্ডুলী পাহাড়ের নীচে। ভাবতেই আমার বুকটা কেঁপে উঠলো, কি সর্বনাশ! বাঘ-ভাল্লুকের আড্ডা ঐ খাণ্ডুলী পাহাড়ে, ওখানেই থাকে ঝুমরিরা! কি সাহস বাবা ওদের! মা বলতেন, ওদের খুব সাহস, ওদের বুকে একটুও ভয় নেই। ওরা খুব সাহসী। মা'র মুখে ওদের সাহসের কথা শুনে ঝুমরিটাকে আরো ভাল লাগত।

তাই ওর সঙ্গে ভাব করে খুব আনন্দ পেলাম। রোজ সকালে ঝুমরি ঝুমঝুমিয়ে এসে দাঁড়াত আমার পড়ার ঘরের জানলার কাছে। একদিন একটা খুব সুন্দর পাখি এনে আমায় উপহার দিয়ে আমার সঙ্গে বন্ধু পাতাল। তার পর থেকে প্রায়ই আমার জন্যে নিয়ে আসত অনেক কিছু। আনত কালো মাটির ভাঁড়ে করে খাঁটি দুধ, বা খাঁটি ঘি, আনত চাকা চাকা টক দই, আবার কখনো ও আনত বৈঁচী ফুলের গাঁথা মালা।

বুঝতাম ও আমাকে খুব ভালবাসে। আমিও মাঝে মাঝে এটা-ওটা দিয়ে ওকে খুশী করতাম। একদিন ওর মাকে দিয়ে আমায় একটা ফুলের সাজি তৈরী করে দিয়েছিল। আর ঐ সাজি ভরে একরাশ হলুদ হলুদ সুরগুজিয়া ফুল এনে উপহার দিয়েছিল। ও একটু একটু হিন্দী বুঝত। আমার তাই সুবিধা হয়েছিল, আমি ওর কাছে বাঘ-ভাল্লুকের কথা বললেই ও হেসে লুটিয়ে পড়ে চোখ বড় বড় করে বলত—ডর? ডর লাগে তুর? হামার ডর না লাগে। ওর বাংলা বলার খুব ইচ্ছে ছিল। তাই একটু একটু বাংলা বলতে চাইত। ওর বাংলা শুনে আমার খুব হাসি পেত।

সারাদিন ঝুমরি থাকত মহুয়াতলায়, বিকেলবেলা ওর মায়ের কাজ সারা হলে সবাই মিলে দল বেঁধে ঘরে ফিরত। যাবার আগে সাঁওতাল মেয়ে পুরুষ সবাই মিলে ইঁদারার পাড়ে বসে গামছায় মেখে ছাতু খেত। ঝুমরিটাও ওর মা-বাবার সঙ্গে বসে বড় বড় করে ছাতুর দলা মুখে পুরত। আমার ভারি শখ হত ওদের মতো অমন করে ছাতুর দলা মুখে পুরি। ঝুমরি আমাকে দেখে বলত, এ খোঁকী, সতুয়া খিবি?

আমি মাথা নাড়তাম—বলতাম, নেহি।

আমাদের বাগানের মালি সুখন—ইঁদারা থেকে জল তুলে ওদের হাতে ঢেলে দিত, ওরা হাতের পাতা দুটো কেমন ঠোঙার মতো করে কোঁৎ কোঁৎ করে জল খেত। আমি চেষ্টা করতাম ওদের মতো করে জল খেতে কিন্তু পারতাম না। ঝুমরিটা খুব ভালভাবে পারত। ঝুমরিটা খুব সাহসী ছিল, বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে একদিন একটা ভাল্লুক ছানা আমার কাছে এনে হাজির করল, আমি তো ভয়ে বাঁচি না। ভাল্লুক-ছানা দেখতে অনেক ছোট ছেলেমেয়ে জড়ো হয়ে গেল, আমরা ভয়ে ভয়ে দেখলাম ঝুমরি মহানন্দে ভাল্লুকছানাটা নিয়ে খেলায় মত্ত। আমি ঝুমরির সাহস দেখছিলাম একটু দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ ঝুমরি ছুটে এসে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলল, তুর্ লেগে ভাল্লু আনলম, তুর এতে ডর? তুর হাঁতে দিবে উ ভাল্লু, চল্। আমার ভীষণ

ভয় করল। কিন্তু ওকে সাহস দেখাবার জন্যে আমায় ভাল্লুকটার গায়ে হাত দিতেই হল। হাতটা ভাল্লুকটার মাথায় ভয়ে ভয়েই দিচ্ছিলাম দেখে ঝুমরিটা ভাল্লুকটাকে একবার আমার কাঁধের উপর বসিয়ে দিয়ে আবার ওটাকে কোলে নিয়েই ছুটে পালাল। ওর কাণ্ড দেখে সবাই অবাক। আমাদের সুখন মালি বলল, সাঁওতাল বাচ্ছা, বহুত হিম্মত্ আছে। কুছ ডর নেহি। মাও বলতেন ওরা ছোট থেকেই সাহসী হয়, বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, বড় বড় নদী সাঁতরে পার হয়। বাঘ ভাল্লুক ভয় করে না। শুনে শুনে আমি অবাক হতাম। বিশ্বাসই হত না। কিন্তু একদিন আমাকে বিশ্বাস করতেই হল।

বর্ষা নেমেছে, পাহাড়ী বর্ষা, উশ্রী নদীতে বান ডেকেছে, কুলি-কামিনরা নদী পার হয়ে আসে একটা তারের ঝোলা পোল পেরিয়ে। বর্ষায় নদীটা এত ভয়ানক হয়ে ওঠে যে—কাছে যাওয়া দূরে থাক, মাইল খানেক দূরেও কেউ যেতে সাহস পায় না। সেই নদী পেরিয়ে রোজ আসা-যাওয়া করত সাঁওতালরা। আমার ভারি ভয় হত, ভাবতাম তারের পোলটা যদি হঠাৎ ছিঁড়ে যায়? কিন্তু ঝুমরিটা আমার ভয়ের কথা জেনে খুব হাসত। একদিনও ঝুমরির আসা কামাই হত না। রোজ আসত নদী পেরিয়ে। আমি বলতাম, তুই রোজ ঐ তারের পোল পেরিয়ে আসিস কেন? পড়ে গেলে মরে যাবি। ঝুমরি আমার কথা নকল করে বলত, হঁ হামে মরে যাবি, তু মরে যাবি না! হামি মরে যাবি রে খোঁকী! ওর কথা শুনে আমার খুব হাসি পেত। ওর সাহসের কথা শুনে শুনে ওকে আমার বেশি ভাল লাগত।

আবার মাঝে মাঝে ওর দুঃসাহস দেখে বুকটা ঢিপ-ঢিপ করত। সব চেয়ে ভয় হত অত বড় নদীটা একটা তারের পোল পেরিয়ে আসাতে। রাতে আমি ঝুমরির কথা ভেবে ভেবে একসময় ঘুমিয়ে পড়তাম। ওর জন্যে আমার দুঃখও হত ভারি, ভাবতাম, এই বর্ষা রাতে ওরা কত কষ্ট করে ছোট্ট পাতার ঘরে ঘুমিয়ে থাকে। আবার ভোরবেলা ঝড়-বাদলের

মধ্যে আমাদের বাড়িতে আসে ওর মায়ের সঙ্গে। ওর মাকে আর বাবাকে আসতেই হত, এক একটা টোকা মাথায় দিয়ে আসত ওরা। জামা-কাপড় তবুও যেত ভিজে। ঝুমরিটাকে বলতাম এই বর্ষার দিনে তুই আসিস কেন? অসুখ হবে যে। ঝুমরি আমার কথা শুনে হেসে গড়িয়ে পড়ত। অদ্ভুত সাহসী আর ডানপিটে মেয়ে ছিল ঝুমরি। ওর সাহসের কথা শুনলে তোমরা বিশ্বাস করতে চাইবে না।

বর্ষা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, চারধারে জল শুকোতে লেগেছে। নদীটা তখনও কানায় কানায় ভরপুর। কুলি-কামিনরা নিয়মিতই আসছে প্রায়। খোঁজ নিয়ে জানলাম—ঝুমরির মা বাবা দু'দিন ধরে আসছে না। তাই ঝুমরিটাকেও দেখছি না। মনটা আমার ভারি খারাপ; মনে ভাবলাম, হয়তো অসুখ-টসুখ করেছে।

রোজ একবার, এর ওর কাছে খোঁজ নিচ্ছি ঝুমরি কেন আসে না? একদিন ঝুমরির গাঁয়ের একটা মেয়ে কাবলসিয়া খবর দিল, দিন দুই হল ঝুমরিটা জলে ডুবে গেছে, ওকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। হায়-হায় করলাম কথাটা শুনে, কেঁদেও ফেললাম। কথাটা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ল আমাদের বাড়িতে, সবাই দুঃখ পেল। শুনলাম, ওর ছোট ভাইটাকে বাঁচাতে গিয়েই বেচারী ডুবে মরেছে। ওর কথা ভেবে ভেবে সবার আড়ালে আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতাম। ঝুমরির জন্যে আমাদের বাড়ির সবাই মন-মরা। ওর সাহসের কথাও সবার মুখে মুখে ফিরছে। কী আর করি, খেলার সাথীকে হারিয়ে মনটা খুবই খারাপ। সেদিন ছিল রবিবার। সকাল থেকে দলে দলে আসছে সাঁওতাল-সাঁওতালির দল, আসছে তাদের সঙ্গে ঝুমরির মতো কত মেয়ে বুধনের মতো কত ছেলে, আমি গালে হাত দিয়ে চুপচাপ করে বাবার পাশে বসে আছি, এখুনি নাম ডাকা শুরু হবে। আমি ভাবছি ঝুমরির কথা।

নাম ডাকা শুরু হল, এক এক করে কুলিরা এসে মাইনে নিয়ে যাচ্ছে। আমি শুধু ভাবছি ঝুমরির কথা, ও আর আসবে না। জলে ডুবে গেছে। ডুবে যাবার সময় নাকে মুখে জল ঢুকে গিয়ে কত না ছট্‌ফট্‌

করেছে ঝুমরি, মাকে কত ডেকেছে, কত কেঁদেছে ! ভাবছি আর ভাবছি ।

হঠাৎ দেখি—আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল ঝুমরি, হাতে একটা ভুট্টা, সঙ্গে ওর বাবা। আমি আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম, বাবা, ঝুমরি। ঝুমরিকে দেখে বাবাও অবাক হয়ে বললেন, হাম্ তো শুনা তু মর গিয়া রে ঝুমরি ! আলন মাঝির কাছে বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার ঝুমরি নাকি জলে ডুবে মরে গিয়েছিল—ওকে পেলে কী করে ? আলন মাঝি যা বলল, তা এই ।—সেদিন ছিল ভরা বরষা, সন্ধ্যেবেলা রোজকার মতো দল বেঁধে ওরা ঘরে ফিরছিল, হঠাৎ হাত ফসকে বুধনটা জলে পড়ে গেল, সবাই চেঁচামেচি শুরু করল, অথচ কেউ অমন ভরা নদীতে ঝাঁপ দিতে চাইল না। এর মধ্যে ঝুমরি চিৎকার করে উঠল—র র রে ভাইয়া, বলেই ও জলে ঝাঁপ দিল। ছু'ভাইবোনের শোকে মা বাবা পাগলের মতো হয়ে গেল। সারা রাত গাঁয়ের লোক কুপী নিয়ে খোঁজাখুঁজি করল, সারা দিন খুঁজল, কোথাও পাওয়া গেল না।

খুঁজতে খুঁজতে চলে গেল আলন মাঝি দূরের গাঁয়ে যেখানে ঝুমরির মাসী থাকে। অবাক কাণ্ড—সেখানে গিয়ে ছাখে সে গাঁয়ে হৈ-চৈ ব্যাপার, মাসীর বাড়ির উঠোনে খাটলিতে ছু'ভাইবোন বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে। আর গাঁয়ের মোড়ল ঝাড় ফুঁক করছে, মাসীটা বসে আছে মাথায় হাত দিয়ে। আলন মাঝিকে দেখে ঝুমরির মাসীটা ডুকরে কেঁদে উঠল। আলন মাঝি ওকে শান্ত করে ঘটনাটা যা শুনল তা এই ভোরবেলা মেয়েরা জল আনতে গিয়েছিল। গিয়ে ছাখে ছুটো মানুষ ভেসে আসছে, পাড়ের কাছাকাছি এসেছে প্রায়, তখন সবাই চেঁচামেচি শুরু করে লোক ডেকেছে। নদীর জলটা অনেক কমে গিয়েছিল তাই রক্ষে, গাঁয়ের ছু-চার-জন পুরুষ এসে টেনে উঠিয়ে ছাখে ঝুমরি আর বুধন। সঙ্গে সঙ্গে অনেক ঝাড়-ফুঁক তুক-তাক করে পেটের জল বার করেছে, তারপর সেঁক-তাপ করেছে, তাই ওদের জীবন রক্ষে হয়েছে। ওর মাসী বনবিবি, তুরুক-বিবির কাছে মানত করেছে। ব্যাপার-স্যাপার শুনে আলন মাঝির চোখ ছানাবড়া, তারপর ছুটোতে সুস্থ হতে ঘরে এনেছে। বুধনটা এখনও ভাল

হয়নি। ডানপিটে মেয়েটা উঠে এসেছে।

বুঝতেই পার, এ সব কথাবার্তা শুনে আমার মনের অবস্থাটা কী রকম হতে পারে? আমি সব শুনে হাঁদার মতো ঝুমরির দিকে চেয়ে রইলাম। ও ঝুমরি, না কোনোও দেবী আমি বুঝতেই পারছিলাম না। সবাই একবার করে ঝুমরিকে দেখে দেখে হাসছিল, আর অবাক হচ্ছিল। বাবা আমাকে বললেন, দেখলি—তোর মতো ছোট্ট মেয়েটার কী ভীষণ সাহস? আমি তো ভাবতেই পারছি না। তোরা হলে কখন তলিয়ে যেতিস। সত্যিই, বাবার কথা শুনে ভাবছিলাম, এটা যেন—বিশ্বাসের বাইরে। ঝুমরির উপর ভালবাসা বাড়ল অনেকখানি। ভাবলাম ঝুমরি আমার চেয়ে অনেক বড়, অনেক মহৎ। চলে এসেছি অনেক বছর হয় সে দেশ ছেড়ে তবু আজও মাঝে মাঝে শাল পলাশের ফাঁকে ফাঁকে খাণ্ডুলী পাহাড়ের ধারের ঝুমরিকে মনে পড়ে।

হনুমতীর বিয়ে

হনুমানের ছোট মেয়ে হনুমতীর আজ বিয়ে। জঙ্গলের সব্বাইকে নিমন্ত্রণ করেছে হনুমান লাট্টুরাম। লাট্টুরাম খরচ করছে খুব। এই তার শেষ মেয়ে। তার উপর যাকে না নিমন্ত্রণ করা হবে তারাই রেগে যাবে।

সকাল থেকে লাট্টুরাম আর তার ভাই ফট্টুরাম নানা গ্রাম থেকে নানা রকম জিনিস এনে হাজির করছে। লাট্টুরামরা তো আর মাছ মাংস খায় না। ওরা যে রামের ভক্ত। তাই সব নিরামিষ খাওয়া।

তাই নিরামিষ রান্নাই হবে, তবে তার সঙ্গে ফলপাকড়টাই বেশী থাকবে।

ইঁদুর গিন্নিরা সকাল থেকেই লেগে গেছে বাটনা বাটতে। লাট্টুরামের মামী পাকা রাঁধুনী, রান্নার ভার সে নিজেই নিয়েছে। যোগাড় দেবার অনেকেই আছে।

লাট্টুরামের বৌ-এর তো আর কাজের সীমা নেই, তার উপর আবার মেয়েটা অনেক দূরে যাচ্ছে চলে। সেই কোন্ সুদূর অযোধ্যায়—একেবারে রামচন্দ্রের দেশে। তাই মনটা খুব খারাপ লাট্টুরামের বৌ সোনামতীর। সে মাঝে মাঝে রান্নাঘরের দিকে আসছে আর যাচ্ছে। আর মেয়েকে দেখছে।

ইঁদুর বেইরা নাকে নথ ঝুলিয়ে ঘোমটা দিয়ে দুলে দুলে বাটনা বাটছে গাদা গাদা।

লাট্টুরাম গাদা গাদা কলা এনে ফেলেছে, ফট্টুরাম এনেছে কাঁঠাল। হনুমতীর সইরা সব্বাই এসেছে, কেউ কেউ হনুমতীকে সাজাতে বসেছে স্নো পাউডার আর শাড়ি গয়না নিয়ে। সকাল থেকে গানের আসর বসেছে, শেয়াল গাইল খেয়াল, গাধা গাইল টপ্পা, আর কোকিল গাইল আধুনিক। রান্নাও প্রায় হয়ে এসেছে। বরও এসে গেছে। খরগোস গিন্নি

শাঁখ বাজাল। লাট্টুরাম আর ফট্টুরাম জামাই নিয়ে ব্যস্ত। সুন্দর একটি ঘর তৈরী হয়েছে লতাপাতা আর ফুল দিয়ে। বর ধুতি পাঞ্জাবি পরে আর গলায় চাদর ঝুলিয়ে এসে বসল ঘরে। বরের সঙ্গে বরযাত্রী এসেছে জনা দশেক। রান্নাও হয়েছে অনেক-অনেক।

বর, বরযাত্রীকে বসিয়ে রেখে লাট্টুরাম হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল, আগে বরযাত্রীদের খাইয়ে দাও। তারপর আর সবাই খাবে। ঘোড়া গাধা শেয়াল সবাই বসে আছে, বিয়েটা দেখে তবে খাবে। বরযাত্রীরা সব্বাই খেতে বসল। ইঁদুর গিন্নিরা সবাই মিলে লুচি বেলছে, আর লাট্টুরামের মামী গরম গরম লুচি ভাজছে, আর খরগোস গিন্নিরা পরিবেশন করছে। বরযাত্রী খেতে ওস্তাদ, আর সবচেয়ে ওরা ভালবাসে কলা খেতে, আগেই ওরা কলার দিকে হাত বাড়াল, গব গব করে কলা খেল, তারপর লুচিতে হাত দিল। এত রকম খাবার দেখে আগে কী খাবে বুঝতেই পারল না। খামচাখামচি করে খেতে লাগল। নিমন্ত্রণ আর কে করে ওদের।

এদিকে বিয়ে শুরু হয়ে গেছে, পুরুত বসেছে রামছাগল, গলায় গামছা দিয়ে। মন্ত্র পড়তে দাড়ি নড়ছে। বিয়েটা হয়ে গেলেই ল্যাঠা চুকে যায়। এমন সময় বাঘের গলার আওয়াজ শোনা গেল, সবাই বুঝল বাঘ মশাই আসছে। ভয়ে সবার বুক ধড়াস্ ধড়াস্। কেউ কেউ কেঁদেই ফেলল ভয়ে আর দুঃখে লাট্টুরাম বুঝল, সব্বাইকে খবর দেওয়া হয়েছে, আসল বাঘ মশাই-ই বাদ পড়েছে। কী সর্বনাশ! এখন উপায় লাট্টুরামের! বৌ সোনামতী কেঁদে ফেলে বলল—উপায় আর কী? বিয়েটা তো হয়ে গেল, এবার যে যার গাছে উঠে পড়, বাঘ মশাই বেশ দূরে আছেন এখনও। এর মধ্যে কিছু খাবারদাবার নিয়ে উঠে পড় গাছের উপর। তাই করল সব্বাই,। বর বরযাত্রী সব্বাই উঠে পড়ল একলাফে গাছে। হনুমানরা তো গাছে চড়তে ওস্তাদ, তাই একলাফে সব্বাই উঠে পড়ল, ইঁদুররা আর খরগোসরা চোঁ-চাঁ দৌড় মারল ঝোপ-ঝাড়ের তলা দিয়ে।

ঘোড়া গাধার আর খাওয়া জুটল না—লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে দৌড়

লাগাল যেখানে পারল। ব্যস্ বিয়ে বাড়ি ফাঁকা। এমন সময় এসে গেল বাঘমশাই, বলল :

হালুম হুলুম,
হালুম হুলুম,
খাবার গন্ধ
পেলুম পেলুম,
খিদের জ্বালায়
গেলুম গেলুম।
খবর পেয়ে
ছুটে এলুম
আজকে নাকি
হন্নুমতীর বিয়ে
নিমন্ত্রণ হল সবার
আমায় বাদ দিয়ে।

বাঘমশাই বিয়ে বাড়ি তছনছ করছে রাগের চোটে, আর বলছে :

কেউ কোথা নেই এ কিরে বাবা
পড়লো কোথায় কেটে
হাঁড়িকুঁড়ি রয়েছে পড়ে
খিল্ ধরছে পেটে।

বাঘ আর কি করে। হাঁড়িকুঁড়ি তছনছ করে ভেঙে ফেলে, মাটিতে আর বরযাত্রীদের পাতায় যা পড়েছিল তাই চেটে পুটে খেয়ে চলে গেল হালুম হুলুম করতে করতে। ভাবল একবার লাট্টুরামকে সামনে পেলে হয়, কেটে কুচি কুচি করে ভাজা করে খাবে নুন আর লঙ্কা দিয়ে।

*

আর লাট্টুরাম ভাবলো, আজ রাত্রেই সবাইকে নিয়ে অনেক দূরের জঙ্গলে পালাবে, যেখানের খবর কোনোদিনও পাবে না।

ফলাই বাবা

পিউ শম্পা জবা আর কিশোর, চারজন খেলছিল পাহাড়ের নীচে শাল বনে। ছুটির ত্বপুর একে তায় আবার মেঘলা করা, ভারি মজা ওদের। কেউ কিছু বলবে না, সবাই এখন বিশ্রাম নিচ্ছে। মায়ের অনুমতি নিয়েই বেরিয়েছে ওরা খেলা করতে। দলপতি হচ্ছে কিশোর। সবার থেকে কিশোর একটু অন্য ধরনের। লেখাপড়ায় খুব ভালো, তা ছাড়া ঠাকুর-দেবতায় খুব ভক্তি। ঠাকুরদের বই পড়তে ভালবাসে। সাধু সন্ন্যাসীর ছবি দেখতে ভালবাসে। সবকিছু প্রশ্ন করে ওর দিদাকে। ঘরে মন টেকে না কিশোরের, খালি মনে হয় বনে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায়।

এই গ্রামটা ওর খুব ভালো লাগছে। শুধু পাহাড় পাহাড় আর বন জঙ্গল আর নদী, গরমের ছুটি কাটাতে এসেছে মামাবাড়ি মামাতো বোন জবা আর পিউ। শম্পা কিশোরের খুড়তুতো বোন। কিশোরের মামার বাড়িতে শম্পাও এসেছে। শম্পার মাও এসেছে শরীরটা একটু সারাতে। মামাবাড়ি ভারি মজা। খাও দাও আর বেড়াও। মামাতো ভাই টুব্‌লুও এসে জুটলো। বেশ ভালোই হলো, টুব্‌লু বললো, কিশোর, ঐ যে পাহাড়া দেখা যাচ্ছে ঐ পাহাড়ের তলায় একজন বুড়ো লোক থাকে। একা একা থাকে, কেউ বলে সাধু, কেউ বলে ত্বষ্টু। কেউ যায় না ওধারে, আগে নাকি থাকতো পাহাড়ের উপরে খড়ের ঘরে, এখন থাকে পাহাড়ের নীচে, যাবি দেখতে কিশোর?

এক কথায় নেচে উঠলো কিশোর, হ্যাঁ হ্যাঁ, চল্।

না বাবা, আমরা যাব না—জবা, শম্পা, পিউ বলে উঠলো।

না গেলি না গেলি, আমরা ত্বজনেই যাবো। যাও, তোমরা বাড়ি চলে যাও, আমি আর টুব্‌লু যাবো—বললো কিশোর।

না না—আমরাও যাবো। আমরা বুঝি লোকটিকে দেখবো না—

বললো জবা শম্পা পিউ।

অ্যাই, যেতে পার তবে কাউকে বলতে পারবে না কথাটা।

আচ্ছা, আচ্ছা, কাউকে বলবো না।

সবাই মিলে চললো বন জঙ্গল পেরিয়ে সেই লোকটিকে দেখতে। সামনেই পলাশ বন, ঝরা পলাশ পড়ে আছে মাটিতে লাল হয়ে। লোভ হবার কথা। কুড়ো কুড়ো, কুড়িয়ে নে। ছেলেমেয়েরা যত খুশি কুড়োলো পলাশ।

আবার চললো, এক জায়গায় কাঠ কাটছিল কয়েকজন সাঁওতাল। টুব্‌লুকে দেখে ইঙ্গিতে বললো, কোথায় যাচ্ছো এই সময় ?

টুব্‌লু বলে দিল কোথায় যাচ্ছে।

তোমরা ওকে চেনো ?

হাঁ হাঁ, উ তো ফলাইবাবা।

ফলাইবাবা ! ওরা অবাক—ফলাইবাবা মানে কি ?

টুব্‌লু হিন্দীতে সবার প্রশ্নের উত্তরটা জেনে নিল লোকটার কাছে। ফলাইবাবা মানে—ফল খেয়ে সারাজীবন কাটাচ্ছে। কেউ ওর মুখ দেখতেই পায় না। কখন যে বাইরে যায় তা কেউ বলতেই পারে না। এত ফল পায় কোথায় ? কিশোর প্রশ্ন করে। লোকটাকে টুব্‌লু হিন্দীতে কিশোরের প্রশ্নটাই করে। লোকটা বলে পাশে খুব বড় বাগান আছে, তাতে অনেক ফল আছে। তোমরা দেখেছ ? একদিন আমরা দেখেছি। লোকটা বললো।

আমরা আজ দেখবো, টুব্‌লু বললো।

লোকটি কাঠ কাটতে কাটতে বললো, যাও।

সবাই চললো ফলাইবাবাকে দেখতে। দরজার কাছে এসে ওরা দেখলো, দরজা বন্ধ, খুট্ খুট্ খুট্—কড়াটা নাড়লো কিশোর। বাড়ি বলা চলে না, লতাপাতা দিয়ে ঘরটা তৈরী। দরজাটা দরমার। দুটো কড়া লাগানো আছে শুধু। কড়া নাড়তেই দারুণ গম্ভীর আওয়াজ এলো—কে ? কিশোর সাহস করে বললো, আমরা। পরিষ্কার বাংলা কথা বলছে।

আমরা কে ? ভিতর থেকে ফলাইবাবা বললো।

খুলেই ছাখো না। ফলাইবাবা কি করে দরজা খুললো ওরা বুঝলো না। দরজাটা খুলতেই ওরা দেখলো, বিরাট মোটা ফর্সা একটি লোক বসে আছে একটা আসনে। মস্ত বড় ভুঁড়িটা ঝুলে পড়েছে প্রায় মাটিতে।

কিশোর চমকে উঠলো। সেই ঠাকুরের বইতে দেখা ত্রৈলঙ্গস্বামী বা বামাক্ষ্যাপা না তো ? ছবি দেখে দিদাকে প্রশ্ন করেছিল কিশোর, এ কে গো ? পেটটা এত বড় কেন গো ? দিদা বলেছিল, এরা সন্ন্যাসী, মহাপুরুষ। এঁদের এই রকমই প্রায় সবার চেহারা হয়। ফল আর দুধ খেয়ে থাকেন কিনা তাই। কিশোর বললো, প্রণাম কর্ তোরা।

ফলাইবাবা খুব হেসে বললেন, বাঃ, তোমরা তো বেশ ভালো ছেলেমেয়ে দেখছি। বসো বসো, তোমরা আমার এখানে এলে কি করে! আমার এখানে আসতে সবাই ভয় পায়! তোমাদের ভয় হলো না ?

কিশোর নির্ভয়ে বললো, না ভয় কি, ভাল লোকের কাছে আসতে আবার ভয় কি ?

আমি যে ভাল লোক তা তোমাদের কে বললো ?

আমরা জানি, কিশোর বললো।

ফলাই বাবা খুব হাসলেন। জবা পিউ আর শম্পা খুব ভয় পাচ্ছিল মনে মনে। দাদাদের সাহস দেখে কিছু বলতে পারলে না।

এ জায়গাটা ভাল না, তাই কেউ আসে না। তোমাদের তো খুব সাহস দেখছি। তোমরা কি চাও ?

কিচ্ছু না, আমরা দেখতে এসেছি তোমাকে। তুমি কেন বাইরে যাও না ?

আমি মানুষকে ভয় পাই, ফলাইবাবা বললেন।

ভয় পাও কেন ? প্রশ্ন করলো কিশোর।

ভয় পাই কেন ? মানুষরা পাপ করে, অন্যায় করে। আর সেই জন্যে যে তারা দুঃখ পায় কষ্ট পায় তা আমি দেখতে পারি না, তাই মানুষের কল্যাণের জন্যে এই নির্জনে বসে সবার কল্যাণ কামনা করি।

আমি যদি সবার সামনে যাই সবাই বিরক্ত করবে। খালি দুঃখ জানাবে আর কাঁদবে, অথচ ঠাকুরের নামগান করবে না। খালি বলবে আমায় টাকা দাও, পয়সা দাও, সোনা দাও, গয়না দাও, ভাল ভাল খেতে দাও। সবাইকে কি ভগবান সব কিছু দেন ? ওরা তা বোঝে না, জানো খোকা-খুকুরা ? তোমরা সহজ সরল সুন্দর ছোট ছোট ছেলেমেয়ে এসেছ শুধু আমায় দেখতে, তাই তো দেখা পেলে। তুমি ফুল নেবে ?

কিশোর পলাশগুলো দেখিয়ে বললো, নিশ্চয়ই ফুল আমি খুব ভালবাসি। ফুলগুলো নিয়ে ফলাইবাবার সামনে রেখেছিল। কিশোরের আজ দারুণ ভাল লাগছে। তুমি কি খাও ?

আমি ? খুব হেসে বললেন ফলাইবাবা, আমি ফল আর দুধ খাই। ওমা, দিদা তো তাহলে ঠিক বলেছে। তাই জন্যেই পেটটা এত মোটা।

এই নাও, তোমরাও ফল খাও যত পার। পাশে একটা ঢাকা ঝোড়া ছিল। সেটা সামনে রেখে বললো, খাও, যত পার।

খুব আনন্দ হলো ওদের। কত আম কত কলা কত ডালিম। কিশোর বললো, তুমি আমাদের সব দিয়ে দিলে, তুমি খাবে কি ?

আমি, আবার হাসলেন ফলাইবাবা। ভগবান আমায় আবার ঝোড়া ভরে ফল দেবেন।

তোমার ভগবান তো খুব ভাল, তোমায় ঝোড়া ঝোড়া ফল দেয়। কেমন করে দেয় ভগবান তোমাকে ?

যাবার সময় আমার বাগানটা দেখে যেও। সব সময় আমার বাগান ভরা ফল থাকে। যিনি আমায় পাঠিয়েছেন, তিনিই আমার খাবার যোগাড় করেন।

এত ফল তুমি তো রোজ খাও না, কি কর ? কিশোরের প্রশ্ন।

আবার হাসলেন ফলাইবাবা। হেসে বললেন, এদেশে যারা খুব গরীব, যাদের খুব খাওয়ার কষ্ট তারা এসে ফল খায় পেট ভরে। যাও, দেখে এসো আমার বাগানটা। ওরা গেল বাগান দেখতে। বাঃ, কি সুন্দর বাগানটা। কত ফুল কত ফল, ভরে আছে গাছগুলো। বাগানের

এক কোণে একটা পাতার ছাউনি দেওয়া ঘর, সেই ঘরে বসে আছে একটা কালো গরু।

এই গরুটার দুধ খান ঐ ফলাইবাবা, কিশোর বললো। জবা বললো, আমরা ফলাইবাবার কাছে থেকে যাই, তাহলে আর পড়াশোনা করতে হবে না, ইস্কুলে যেতে হবে না। পিউ বললো, থাকবো কোথায় ? শম্পা বললো, কেন ফলাইবাবা আমাদের জন্যে বুঝি একটা ঘর করে দিতে পারবে না ! আহা কি আবদার গো, তোমার জন্য একটা ঘর করে দেবেন তুমি যেন কি একটা—হাত নেড়ে বললো কিশোর। অ্যাই ছাখ কত পাকা আম ঝুলছে, খাবি পেড়ে ? জবা বললো, খবরদার। ফলাইবাবা টের পাবেন। টুব্‌লু বললো, আহা ফলাইবাবা তো ঐ দূরে ঘরে বসে আছে।

জানিস না তো ফলাইবাবা সব জানতে পারে। কিশোর বললো। আহা সব জানতে পারবে, সম্পা কথাটা শুনে নিয়ে সবার আড়ালে টুক করে আম পেড়ে নিল। এত নীচু গাছে আম ঝুলছে দেখে ভারি মজা লাগলো শম্পার। ভাবলো দেখি কেমন ফলাইবাবা জানতে পারে। এদিকে জবা আর পিউও দুটো কোন ফাঁকে ছিড়ে নিয়ে লুকিয়ে রাখলো। তারপর বাগানের একটা কোনায় গাছের নীচে রেখে দিল, কেউ রাখলো গরুর ঘরের পাশে, ধরা পড়লো তিনজনেই তিনজনের কাছে। তারপর চললো ফলাইবাবার ঘরে। আবার গিয়ে বসলো পাঁচটি ছেলে-মেয়ে। ফলাইবাবা খুব হাসতে লাগলেন। হাসি যেন আর থামছে না। সবাই ভয় পেল, কি জানি রে বাবা ফলাইবাবার মনে কোনো দুষ্টু বুদ্ধি জাগলো না তো ?

হাসি থামিয়ে বললেন ফলাইবাবা, খুকুরা মাত্র একটা করে আম পাড়লে ? তাও আবার লুকিয়ে রেখে এলে, খেয়ে ফেলতে পারলে না ?

সর্বনাশ ! তবে তো···ভাবতে গিয়ে তিনজনের গলা বুক শুকিয়ে গেল। চোখগুলো আমড়ার আঁটির মতো হয়ে গেল। কিশোর আর টুবলু বোবা হয়ে গেল, মুখ দিয়ে আর স্বর বেরুচ্ছে না যেন। ওরে বাবা এ নিশ্চয়ই ত্রৈলঙ্গস্বামী। দিদা বলে, এঁরা সবার মনের খবর রাখেন।

ওদের এত ভয় দেখে ফলাইবাবা বললেন, ভয় নেই ভয় নেই খুকুরা, তোমরা যত পার আম পেড়ে খাও। তবে দেখো সাবধান! আমার একটা বাঁদর আছে। সে যেন তোমাদের ভাখে না। তার উপর ঐ বাগানের ভার দেওয়া আছে, গাছে হাত দিলে ও মারধোর করতে পারে। তাছাড়া বেশিক্ষণ তোমরা থেকো না। সন্ধ্যে হলে এখানে ভয় আছে।

না, আমরা আর আম পারবো না, আমরা চলে যাচ্ছি। কথাটা বলে ফলাইবাবা খুব হা হা করে হাসলেন। সে হাসিতে সারা বন পাহাড় কেঁপে উঠলো।

বাড়িতে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়েছে, কোথায় গেল ছেলেমেয়েগুলো, সবাই ভেবে আকুল। কে আর জানে ফলাইবাবা কে আর কোথায় থাকে। ছেলেমেয়েরা বাড়ি ফিরলে সবার বকাবকি শুরু হলো। টুব্‌লু বললো, বকছো কেন। শুনেই নাও না আমরা কোথায় গেছিলাম। এক সাধুবাবার কাছে আমরা গেছিলাম। একে একে সব কথা বললো ওরা। সব শুনে ওরা অবাক! সে কি রে! সে আবার কোথায়? কিশোরের মামা বললেন। বললেন, কৈ এতদিন এখানে আছি ফলাই-বাবার নাম তো শুনিনি বাবা।

চলো না আমরা দেখিয়ে দেবো কোথায় থাকে—কিশোর বললো।

মাঠ ঘাট পেরিয়ে সবাই চললো ফলাইবাবাকে দেখতে, গিয়ে দেখলো ফলাইবাবার ঘরের দরজা খোলা। কেউ কোথাও নেই। খোঁজ খোঁজ, কোথাও আর পেল না ওরা ফলাইবাবাকে খুঁজে। কিশোরদের কথা মিথ্যে হয়ে গেল। ওরাও বোকা বনে গেল, সত্যি কথাটা মিথ্যা হয়ে গেল বলে। তবে ঘরে ধূপের গন্ধ আর ফলের ঝোড়া দেখে কিশোরের মামা একজন কেউ যে থাকে ও ঘরে তা আন্দাজ করে নিল। তবে কোথায় গেল মানুষটা? সবাই নিরাশ হয়ে ফিরলো বাড়িতে। এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার বলে মনে হলো সবার।

কিশোর রাত্রে স্বপ্ন দেখলো—সেই মানুষটি মানে, ফলাইবাবা,

বলছেন, কিশোর সবাই আমাকে দেখতে আসবে আর বার বার বিরক্ত করবে বলে আমি পাহাড়ের চুড়োয় চলে এসেছি। কাউকে বোল না। এই নাও ফল, এই নাও কালো গরুর দুধ, খাও, কিশোর হা করলো, ফলাইবাবা ঘটি থেকে দুধ ঢালতে লাগলেন, কিশোরের নাক মুখ ভর্তি হয়ে গেল সেই দুধে।

আঃ, কি মিষ্টি সে দুধ খুব খাচ্ছে, খেতে খেতে এক সময় ঘুমটা ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখলো কোথায় দুধ আর কোথায় ফল। গলাটা শুকিয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে মুখ ধুয়ে এক গেলাস জল খেয়ে নিল কিশোর।

নাকলম্বুজ

আমাদের বাড়িতে দুধ দিতে আসত একটা গোয়ালিনী। তার নাম ছিল সরবতিয়া। আমাদের বাড়িতে ছিল চারটে দুধওয়ালা গরু, দুবেলা প্রচুর খাঁটি দুধ দিত, তবুও সরবতিয়া জোর করে মাকে কিছু দুধ দিয়ে যেত। বেচারী খুব গরীব ছিল। তাই মা ওর কাছ থেকে কিছু দুধ কিনতেন। ও আসত রোজ বিকেলবেলায়। যদিও ওর নাম ছিল সরবতিয়া। কিন্তু আমরা ঐ সুন্দর নামটি ধরে ডাকতাম না, আমরা ডাকতাম নাকলম্বুজ। অবশ্য ওর চেহারার সঙ্গে নামটির যথেষ্ট মিল ছিল। মানুষটি ছিল ইয়া লম্বা। যাকে বলে বেধরাক্কা লম্বা, আর নাকটাও ছিল তেমনি লম্বা। কাজেই আমি আর আমার দু বোনঝি শেফালি বিজলি ঐ নামটিকে আবিষ্কার করে ফেললাম।

ডাকা যেত অনেক নামেই যেমন ধর গোয়ালনী দিদি, গোয়ালনী মাসী। উঁহু—ওসব নামে আমাদের মোটেই ডাকতে ইচ্ছে করত না।

ছোড়দি একদিন বলে বসল, ও কিন্তু ডাইনি বুড়ি। রাত্রে থাকে অশ্বথ গাছে, আর দিনের বেলা মানুষের রূপ ধরে বাড়ি বাড়ি দুধ বেচে। এই দুধের ব্যবসার পিছনে নাকি আছে কচি কচি ছেলে মেয়ে ধরার ফন্দি। কথাটা যখন ছোড়দি বলেছে, তখন মিথ্যে হলেও আমরা সত্যি বলেই মেনে নিলাম। একদিন জানলার ফাঁক দিয়ে চুপি চুপি দেখলাম, নাকলম্বুজ মার সঙ্গে কথা বলছে। খুঁতিয়ে খুঁতিয়ে আমরা দেখলাম, হ্যাঁ, ছোড়দির কথার সঙ্গে চেহারাটার হুবহু মিল আছে। নাকটা ইয়া লম্বা, চোখ দুটো আগুনের ভাটার মতো লাল লাল, মুখের ভেতর একটা দাঁতও নেই। কী কুৎসিত চেহারাটা, ভাল করে দেখে দেখে ধারণাটা একেবারে সত্যি হয়ে গেল। সেই থেকে আমরা ওকে দেখলেই নাক-লম্বুজ ডাকতাম। প্রথম প্রথম নাকলম্বুজ আমাদের কিছুই বলত না।

পরে কে যেন নাকলম্বুজের মানেটা ওকে বুঝিয়ে দিয়েছিল, তারপর থেকে আমরা ঐ নামে ডাকলেই আমাদের দিকে তেড়ে আসত। আমরাও খুব ক্ষ্যাপাতাম। মা বলতেন, আজেবাজে নামে ডাক কেন? মানুষটা ভাল, তা ছাড়া খুব গরীব। এসব নাম ডেকে ক্ষ্যাপালে দুঃখ পাবে। আরে আমরা তো ওসব ভালভাবেই বুঝতাম। কিন্তু ওসব কথায় আমরা খুশী হতে পারতাম না। ওকে ডাইনি বুড়ি ভাবতেই ভারি আনন্দ পেতাম।

মা একদিন হেসে বললেন, অমন করে ক্ষেপিও না। দেখ না কি রকম লম্বা চওড়া মানুষটা, রেগে গেলে আছাড় মেরে কোনদিন মেরে ফেলবে। ওর কাছে তোমরা পুঁটিমাছের মতো। আমাদের কিন্তু ঐ ওকে ভয় পাওয়াটাকেই ভাল লাগত। আমরা ডাকব নাকলম্বুজ, দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ও তেড়ে আসবে আর আমরা ভয়ে লুকিয়ে পড়ব। ঐটাই তো আমাদের আনন্দের ছিল। সরবতিয়া ভালমানুষ, সরবতিয়া বেচারী খুব গরীব। ঐসব ভাবতে গেলেই তো আর ওকে ভয়:করা চলবে না? ভয়ের মধ্যেই ছিল আমাদের আনন্দ। ওকে ডাইনী ভাবতে খুব ভাল লাগত। তার উপর আবার একদিন ছোড়দি বলে বসল কে যেন দেখেছে ও দিনেরবেলায় মানুষের মতো হাঁটে সন্ধ্যে হলেই পা দুটো বেঁকে যায়। আর চলে যায় মামাবাড়ির ভূতুড়ে বাগানটার ভিতরে। শুনলাম আমরা চোখ বড় বড় করে, ভয়ের আরও খোরাক জুটল। কে দেখেছে কে ছোড়দিকে বলেছে ওসব কথা আমরা জানতে চাই না। দেখেছে যে কেউ হোক আর ও যে একটা পেত্নী তা ধরা পড়েছে। ব্যস আর আমাদের সন্দেহ রইল না। আর সত্যি মিথ্যে বিচার করার ইচ্ছেও ছিল না আমাদের। এসব কথা শুনে মা হেসে বলতেন তোর ছোড়দির যত আজেবাজে কথা। শুনলেই হাসি পায়।

গরমের ছুটি পড়েছে, একদিন দুপুরবেলা চলেছি আমি শেফালি আর বিজলী মাঠ পেরিয়ে মামার বাড়ি। সেখানে গিয়ে মামাতো ভাই বোনদের সঙ্গে যাব আম বাগানে। যাব এক খাব্‌লা করে নুন নিয়ে

মজা করে খাব কাঁচা আম পেড়ে নুন দিয়ে। কী মজা। আমাদের বাড়ির বাগানভরা নানা ফলফুল থাকত। কিন্তু বাবার ছিল বড্ড বেশী নিয়মকানুন। ফল পাকুক, তারপর পাড়া হোক, ফলগুলো আনা হোক মার কাছে তারপর যার যত খুশি খাও, ঢালাও হুকুম। তাই বলে যখন-তখন ডালপালা ছিঁড়ে ভেঙে আম জাম খাওয়া চলবে না। কিন্তু মামার বাড়ির ছিল ঢালাও হুকুম—ডালপালা ছেঁড়ো ভাঙ কুছ পরোয়া নেহি। কাজেই মামার বাড়ির কাঁচা আম খেতে আমাদের যেতেই হত।

মামাতো ভাই-বোনও তো আর কম ছিল না? বেশির ভাগই আমাদের সমবয়সী ছিল। কাজেই মজা হত খুব। আমরা চলেছি শাল মহুয়ার ছায়ায় ছায়ায় মাঠ পেরিয়ে মামার বাড়ি। হঠাৎ বিজলি বলে উঠল চিৎকার করে উঠল ভীষণ ভয় পেয়ে। ও বাবাগো—নাকলম্বুজ! ওর চেঁচানিতে চমকে চেয়ে দেখি মামাবাড়ির ঠিক সামনের মাঠে ইঁদারায় জল তুলছে নাকলম্বুজ। আমরা আর থাকি সেখানে! দে ছুট দে ছুট।

ছুটতে ছুটতে শুনতে পেলাম নাকলম্বুজ বিকট চিৎকার করছে পেত্নীর মতো খোনা খোনা গলায়, এ খোঁকী এ খোঁকী। ডাক শুনে আরো ছুট লাগালাম জোরসে। বাব্বা! একে ডাই বুড়িনি তার উপর আবার এই নিরিবিলি দুপুরে আমাদের ডাকা? মতলবটা যে কচ্‌কচিয়ে আমাদের নরম নরম মাংসগুলো খাওয়ার সেটা তো আমরা বুঝেই ফেললাম। ছুটতে ছুটতে আর হাঁপাতে হাঁপাতে পঞ্চাশটা সিঁড়ি পেরিয়ে একেবারে মামাবাড়ির মধ্যের দালানে গিয়ে বসে পড়লাম। মেজমামা খবরের কাগজ পড়ছিল ইজিচেয়ারে শুয়ে, আমাদের ঐ অবস্থায় দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বললেন, কী হল, কী হল তোদের। এমন হাঁপাচ্ছিস কেন?

আর হাঁপাচ্ছি কেন? সে যদি শোন, ভাববে একটা দারুণ ফাঁড়া গেছে আমাদের উপর দিয়ে। মেজমামার ডাকে মামীরা আর ভাই-বোনেরা এসে জড়ো হল। ব্যাপারটা কি? ব্যাপারটা কি?

বিজলীই বলল গুছিয়ে-টুছিয়ে ব্যাপারটা কি? শুনে বাড়ির সবাই

হেসেই বাঁচে না। আমাদের ভারী রাগ হচ্ছিল, আমাদের এই বিপদের কথা শুনে ওদের হাসি দেখে। মেজমামা বললেন, আরে বোকারা—ও তোদের ক্ষতি করবে কেন ? ও যে আমাদের বাড়িতে রোজ জল দেয়, তা ছাড়া সরবতিয়া তোদের বাড়িতেও তো দুধ দেয়—তাহলে তাকে ভয় পাবার কারণ কি ? আর কারণ কি ? কারণ আবার আছে নাকি ? আমরাই তো কারণ খুঁজে বের করেছি মাথা ঘামিয়ে। আমরা কি আর জানি না—ওর নাম সরবতিয়া। ও আমাদের বাড়িতে দুধ দেয়, আর তোমাদের বাড়িতে জল দেয় ? তবু আমরা ভয় করি ডাইনি বুড়ি বা পেত্নী ভেবে। সবাই মিলে আমাদের নিয়ে খুব হাসাহাসি করল। সেজমামা গম্ভীর সুরে বললেন, সত্যি খুবই অন্যায় কথা, দুপুরবেলা, নিরিবিলি মাঠের মাঝে ছোট ছোট মেয়েগুলোকে ডাকবেই বা কেন নাকলম্বুজটা ? মতলব ভাল ছিল না মোটেই। খুব একটা ফাঁড়া গেছে বলতে হবে। দাও দাও ওদের খেতে দাও। বড্ড ফাঁড়া গেছে ওদের আজ। মেজমামী এক ডিস বোঝাই খাবার এনে হাজির করলেন। বড় বড় মোয়া, লাড্ডু আর কাঁঠাল। আমরা মহানন্দে খেয়ে নিলাম। তার-পর ছোটরা সবাই মিলে বাগানে ঢুকে খুব করে কাঁচা আম পেড়ে খেয়ে বিকেলের দিকে বাড়ি ফিরলাম। বাড়ি ঢুকে ছোড়দির কাছে কিছুটা বকা খেলাম। পরে বললাম ব্যাপারটা ছোড়দির কাছে।

ছোড়দি বলল, যেদিন ও নিয়ে পালাবে তোদের সেদিন মজাটা বুঝবে। আমরাও খোঁজখবর করব না। একদিন নাকলম্বুজ আসছে দেখে ছোড়দা আমার হাত ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে চলেছিল নাকলম্বুজের কাছে। আমি গড়িয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলাম। ছোড়দা খুব হাসছিল। হাত ছাড়া পেয়ে আমি দে ছুট ঘরের মধ্যে। আমার বুকটা ভয়ে ঢিপ্ ঢিপ্ করছিল।

নাকলম্বুজ আসত রোজ আমাদের বাড়ি। কিন্তু আমরা সামনে যেতে পারতাম না। পিছন থেকে চেঁচাতাম নাক, নাক—নাকলম্বুজ।

একদিন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। আমরা কজন বসে

বসে বাদাম খাচ্ছিলাম—ইদারার পাশে মহুয়া গাছের নীচে। দুধের বালতি নিয়ে ঘরে ফিরছিল নাকলম্বুজ, আমাদের দেখে নাকলম্বুজ বিকট হেসে উঠল ফোকলা দাঁতে। আমরা ভয়ে মড়ার মতো হয়ে গেলাম। পালাতেও পারলাম না। বসে বসে কাঁদতে লাগলাম। দেখলাম আমাদের সামনে আর না এসে অন্য পাশ দিয়ে চলে গেল। আমরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। আমার মামাতো বোন অনু বলল, নাকলম্বুজটা কি মানুষ না অন্য কিছু বুঝতেই পারি না—বলেই বাদাম ছাড়িয়ে মুখে পুরল। বিজলী বলল, এখন বোধহয় ভূতুড়ে বাগানে চলেছে। চল বাবা পালাই। আমাদের দেখে গিয়ে হয়ত পেত্নীর দলকে ডেকে আনবে। চল পালাই। পালাই বাবা বলে আমরা সবাই চোঁ চাঁ দৌড়। আমাদের কাণ্ড দেখে মা একদিন আমাদের বকলেন, বললেন, নাকলম্বুজ বল কেন ? ওর নাকটা না হয় লম্বাই আছে। সবাই কি আর তোমাদের মতো খ্যাঁদা বোঁচা হবে নাকি ? ওকে ভয় কর ; ওর তাতে দুঃখ হয় না ? ওর ছেলেপুলেই ও তোমাদের ভালবাসতে চায় তোমরা খালি আজেবাজে কথা বল। ওর প্রাণে কত দয়ামায়া আছে তা কি তোমরা জান ? ওকে আর নাকলম্বুজ বোল না।

মার কথা খুবই শুনতাম। কিন্তু নাকলম্বুজ বলে ডেকে ফেলতাম মাঝে মাঝে। মনে মনে ভাবতাম ঐ চেহারায় আবার মায়াদয়া থাকে নাকি ? ঠাকুমার ঝুলির ডাইনী বুড়ির মতো দেখতে তার আবার মায়া দয়া ? কিন্তু সত্যি সত্যি একদিন ওর মায়া দেখে অবাক হয়েই গেলাম। আর সেদিন থেকেই নাকলম্বুজ আমাদের কাছে সত্যি সত্যি মানুষ হয়ে গেল।

একদিন আমার সামান্য জ্বর হয়েছে। তাতেই বাড়ির লোক অস্থির। সবাই এসে একবার করে মাথায় হাত বুলিয়ে যাচ্ছে। ছোড়দি ঘন্টায় ঘন্টায় এসে জ্বর দেখে যাচ্ছে। বাবা নাড়ী দেখে যাচ্ছেন। মা আর ছোড়দা তো সব সময় পাশেই বসে আছেন। কারণ অসুখ হলে আমার মনটা ভীষণ খারাপ লাগে আজও। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, ঘুম আসছে না। মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে। চোখটা বুজেই ছিলাম। মাথায় কে

যেন হাত বুলোচ্ছিল।

মা হেসে বললেন, দেখ তোমার মাথায় কে হাত বুলোচ্ছে। কোনও রকমে চোখটা খুলে দেখি ভীষণ কাণ্ড! নাকলম্বুজ মাথায় হাত বুলোচ্ছে। ছোড়দা বলল, দেখ্ তো তোকে কত ভালবাসে? তোরা তো ওকে নাক-লম্বুজ বলে ক্ষ্যাপাস।

নাকলম্বুজ বলল, শির্মে বহুত দরদ খোকী? শির দুখ্তা? আমার মুখ দিয়ে কথা বেরোল না। আমি চুপ করে গেলাম। নাকলম্বুজ আমার মাথা টিপতে লাগলো। জানি না ও কি মন্ত্র দিল—আমি বেশ আরামে ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোরবেলা মুখ ধুইয়ে মা আমাকে গরম গরম দুধ আর পাঁউরুটি খাইয়ে গেলেন। আমি বসে রইলাম বাইরে, বাগানটার দিকে চেয়ে বসে আছি চুপচাপ। পাশের ঘরে বসে শেফালি বিজলী স্কুলের পড়া তৈরী করছে। তখনকার মতো আমি একা। ঘরে ঢুকলো নাকলম্বুজ। একটা ছোট্ট বেতের ডালায় করে দুটো লাড্ডু আর চকচকে পিতলের ঘটি করে এক ঘটি গরম দুধ এনে আমার সামনে রেখে বলল, খা লে। ব্যাপার স্যাপার দেখে আমি অবাক। আমি মাকে ডাকলাম। ডাক শুনে মা ছোড়দি দৌড়ে এলো—নাকলম্বুজের কাণ্ড দেখে মা হিন্দীতে বললেন, বাড়িতে এত দুধ, তুমি আবার দুধ আনলে কেন বল তো? ফোকলা দাঁতে হেসে নাকলম্বুজ বলল, খোঁকীয়া খিবে। ওর সামনেই আমাকে ওর দেওয়া লাড্ডু একটা খেতে হল। আর একটি রাখলেন শেফালি বিজলীর জন্যে। আমি লাড্ডুটা খেতে নাকলম্বুজ একটা খুশীর হাসি হাসল। আমরা ওর প্রশংসা না করে পারলাম না। বললাম—তুম্ বহুত আচ্ছা আদমী। (তুমি খুব ভাল লোক।) আমার কথায় ও খুব হেসে চলে গেল! ভাবলাম আর কোনোদিনও নাকলম্বুজ বলব না। মা বললেন, দেখলে—নাকলম্বুজ ডাইনি না মানুষ। বিজলী নাক নাচিয়ে বলল, আহা লাড্ডু আর দুধ খাওয়ালেই বুঝি ডাইনি বুড়িরা মানুষ হয়ে যায়? ওর কথা শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

কাল্লু সর্দার

ছেলেবেলায় আমরা কাল্লু সর্দারকে ভীষণ ভয় পেতাম। লোকটার চেহারাটা ছিল দৈত্যের মতো। আমরা যখন দেখেছি তখন কাল্লুর বয়স সত্তর হবে। দেখতে ছিল কুৎসিত। কালো কুচকুচে রঙ, বিরাট লম্বা-চওড়া দেহ, মুখখানা ছিল কালো হাঁড়ির মতো। তার উপর চোখ দুটো ছিল আগুনের ভাঁটার মতো লাল লাল, আর বড় বড়, একটা চোখের মণি ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল। হাত-পাগুলো ছিল যেন গাছের খুঁটি, বুকের ছাতি ছিল মস্ত বড়, সব মিলিয়ে একটা দৈত্যের মতো ছিল এই কাল্লু সর্দার। একেই ঐ চেহারা, তার উপর আবার মা'র মুখে শুনেছিলাম যে সে নাকি একসময় ডাকাতদের সর্দার ছিল। সর্বনাশ! সেই কথা শুনে তো আমাদের আত্মারাম খাঁচা।

বুড়ি দাই হুঁকো টানতে টানতে আমাদের কাছে কাল্লু সর্দারের ডাকাতির গল্প শোনাত মাঝে মাঝে। যতই শুনতাম ততই ভয় হত ওকে। কিন্তু আবার দেখতেও ইচ্ছা হত ওকে ভীষণ। আমাদের রান্নার ঠাকুর ভিক্ষারী দোবে বলেছিল, কাল্লু সর্দারের দল যেদিন একদল আংরেজের (ইংরেজ) কাছে ধরা পড়ল, কাল্লুটা জান্ নিয়ে পালাল বটে, কিন্তু একটা তীর এসে ওর চোখটা খারাপ করে দিল। এখন কাল্লু আর ডাকাতি করে না; সব খারাপ কাজ ছেড়ে দিয়েছে। এখন নাকি বনবিবির পুজো করে। গ্রামের সবাই ওকে খুব মানে। খৈনি টিপতে টিপতে ভিক্ষারী দোবে বলেছিল। কিন্তু এখন কাল্লু সর্দার ভাল হয়েছে, ধর্মে-কর্মে মন দিয়েছে। ওসব বিশ্বাস হতো না মোটেই। সে একজন ডাকাত, ব্যস্, এইটাই আমাদের বিশ্বাস ছিল। দূর থেকে তাকে আসতে দেখেই আমরা চোঁ চোঁ করে দৌড় লাগাতাম। কাল্লু সর্দার কিন্তু কোনো দিকে তাকাত না। বড় বড় পা ফেলে মাথাটা নীচু করে চলে যেত। সে ছিল জাতে সাঁওতাল।

আমরা থাকতাম ছোটনাগপুরের ছোট্ট সুন্দর শাল মহুয়ায় ঘেরা শহর গিরিডিতে। আমার বাবার ছিল অভ্রের ব্যবসা। অতএব আমাদের অভ্রের গুদামে কাজ করতে আসত অনেক সাঁওতাল মেয়ে পুরুষ। কাল্লু সর্দার আসত ওদের সর্দার হিসেবে। বাবা ওকে খুব ভালবাসতেন। বলতেন এত বয়স হয়েছে তবু কাজে একটুও কুড়েমি নেই। বিকেলে কাজের ছুটি হলে আমাদের ইঁদারার ধারে ঝাঁকড়া মহুয়া গাছটার নীচে বসে গামছায় মেখে ছাতু খেত। তারপর ইঁদারা থেকে জল তুলে এক হাতে বালতি ধরে অন্য হাতে কোঁৎ কোঁৎ করে জল খেত। আমরা আমাদের জানলা দিয়ে দেখতাম। আমাদের বুড়ি দাই আর একদিন বললে, কাল্লুটা খুব শয়তান ছিল। ডাকাতি করতে গিয়ে অনেক মানুষ কেটেছে। রোজ রাত্রে মশাল নিয়ে যেত ডাকাতি করতে। বুড়ি দাই আর ভিক্ষারী দোবে দেখেছে। বন পাহাড় ডিঙিয়ে চলেছে কাল্লু সর্দারের দল। ওদের মুখে ঐ সব কথা শুনে আমাদের ছোট্ট নরম নরম বুকগুলো কেঁপে উঠত। রাত্রে কাল্লুর মুখটা মনে পড়লে ভয় পেয়ে মাকে জড়িয়ে ধরতাম। এহেন দৈত্যরাজ কাল্লু সর্দারকে কিন্তু একদিন আমরা ভাল বলতে বাধ্য হলাম।

সেদিন ছিল প্রথম বসন্তের মেঘলা দুপুর। ছুটি ছিল স্কুল। তাই আমরা বন্ধু সাথীরা গেলাম দল বেঁধে নদীর ওপারে বেড়াতে। ছুটি থাকলেই মন টানত বনপাহাড়ে। নদীতে জল ছিল হাঁটুর নীচে। কাজেই অনায়াসে পার হয়ে গেলাম নদীটা। ওপারে উঠে আর আমাদের আনন্দ দেখে কে? যেদিকে তাকাই, শিমূল আর পলাশে লালে লাল হয়ে গেছে বন। আমাদের মনে লাগল খুশীর দোলা, পলাশের বনে বনে আমরা নেচে নেচে হাতে তালি দিয়ে রবিঠাকুরের গান, অমিতা ঠাকুরের কাছে শেখা, গাইতে লাগলাম—

আজ আমাদের ছুটি রে ভাই
আজ আমাদের ছুটি।
কি করি আজ ভেবে না পাই—

পথ হারিয়ে কোন বনে যাই—
কোন মাঠে যে ঘুরে বেড়াই
সকল ছেলে জুটি।

সত্যি, কি আনন্দই লাগছিল সেই দিনটায়, একে ছুটির দুপুর তায় আবার বনপাহাড়ে বেড়ানো। আজও সে সবুজ কৈশোর মনে পড়লে কেমন যেন উন্মনা হয়ে যাই। দূরে মস্ত পাহাড় খাণ্ডুলী দেখা যাচ্ছে। তারই নীচে ছোট্ট ছোট্ট গ্রাম সাঁওতালদের, থেকে থেকে মাদল বাঁশীর সুর এসে আছড়ে পড়ছে বনপাহাড়ে। মিষ্টি দিনে মিষ্টি খেলা শুরু হলো আমাদের। থোকা থোকা লাল পলাশের দল শুনছিল বুঝি আমাদের মিষ্টি গলার গান। তাই বুঝি গানের তালে তালে দোল খাচ্ছিল থোকা থোকা পলাশগুলো। গান থামিয়ে আমরা হাত বাড়ালাম ডালের দিকে পলাশের আশায়, কিন্তু ওরা রইল ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তবু আমরা ছেলে মেয়ের দল উৎসাহে ঝুলোঝুলি করতে লাগলাম নীচু শাখাগুলো ধরে। আমার এক বোন অনু বলল, দাঁড়াও, আমি উঠব গাছে। সে তোড় জোড় করছিল গাছে উঠবার জন্য। এমন সময় পিছনে পাতা-মরমরানি শব্দ শুনে পিছনে চেয়ে যা দেখলাম, তাতে মনের আনন্দ হওয়া দূরের কথা, ভয়ে হাত-পা ঠ্যাণ্ডা হয়ে আসতে লাগল। ভাবলাম, এবার আর কোনো উপায় নেই, যেতে হবে ডাকাতের হাতে। দেখলাম, বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে আসছে কাল্লু সর্দার আমাদের দিকে। কিন্তু কাল্লু সর্দারের ব্যবহারে আমাদের অবাক করে দিল। সে আমাদের সামনে এসে বিরাট লম্বা হাতটা উঠিয়ে উঁচু ফুলের ডালটা একেবারে হাতের সামনে নুইয়ে বলল, লে কিত্‌না ফুলা লিবি লে লে। আমরা অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলাম। সে এবার বিশ্রী মুখে ঘ্যা ঘ্যা করে হেসে বলল, লে খোঁকীয়া ফুলা লে। আমরা আর দেরী করলাম না, হুড়াহুড়ি করে পলাশ ফুল তুলতে লাগলাম। পরে ভাবনায় পড়লাম, এত ফুল নেব কিসে? কাল্লু কি বুঝল কে জানে। কতগুলো শাল পাতা কুড়িয়ে কাঠি গেঁথে গেঁথে বড় বড় ঠোঙা

করে তার মধ্যে ফুল ভরতে লাগল সুন্দর করে সাজিয়ে। আমরা অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম। ফুলগুলো গুছিয়ে ঠোঙাগুলো আমাদের হাতে দিয়ে বলল, চল্, ঘর চলে যা। আভি ভাল্লু নিকলাবে, শের নিকলাবে, চ্যাল্ যা। আমাদের ভয় হলো, খাণ্ডুলী পাহাড়ের মাথা থেকে বাঘ ভাল্লুক সন্ধ্যে হলে নীচে নামে। অনেক দিন রাত্রে বাঘের ডাক শোনা যায় আমাদের বাড়ি থেকে। সঙ্গে আমাদের বড় কেউ ছিল না। আমরা সব ছোটোর দল। জংলা দেশের ঠিক নেই, যখন তখন হায়না ভাল্লুক বেরিয়ে পড়ে মহুয়া খেতে বা বুনো ফল খেতে।

আমরা চললাম রাশি রাশি পলাশ নিয়ে। কাল্লু চলল আমাদের পিছন পিছন। নদীর সামনে এসে বলল, আ যা গদ্দিমে। আমরা কিন্তু ওর কোলে উঠতে চাইনি, ও কিন্তু জোর করে কোলে করে পার করে দিল। আমাদের বলার আর কিছু রইল না। যাকে এতদিন ডাকাত ভেবেছি, নিষ্ঠুর ভেবেছি, ভীষণ একটা এমন কি দৈত্যও ভেবেছি, তারই কোলে উঠে, আমরা আনন্দে আর বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেলাম। চলতে চলতে আমরা দেখছিলাম কাল্লু আমাদের চলার পথে করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। অনেকটা দূরে এসে শেষবারের মতো চেয়ে দেখলাম, কাল্লু শালবনে মিলিয়ে গেলো। ও থাকে খাণ্ডুলী পাহাড়ের নীচে সাঁওতাল পল্লীতে। আমার সবুজ নরম প্রাণটা কেন যেন ওর জন্য কেঁদে উঠল। ভাবলাম, এবার আর ওকে ভয় পাব না। সামনে গিয়ে কথা বলব। মাকে গিয়ে কাল্লুর কথা বললাম। মা বললেন, মানুষের মধ্যে থাকে ভাল মন্দ দুটোই। ভাল কাজ করলে যেমন আনন্দ পাওয়া যায় খারাপ কাজ করলে পরে আসে অনুতাপ আর দুঃখ। কাল্লু খারাপ কাজের অনুশোচনা করেছে ভাল কাজ করেই। আজকাল ও ভাল কাজই করে।

পুজোর জামা

পুজো এসে গেছে একেবারে নাকের ডগায়। হ্যাঁ, তা তো পথঘাট আর আলো ঝলমলে দোকানের চেহারা দেখেই মালুম হচ্ছে। সারা শহরময় হৈ চৈ পড়ে গেছে। দোকানে দোকানে প্রচণ্ড ভীড় চলেছে। পথের দু পাশের দোকানগুলোতে কত সুন্দর সুন্দর জামা কাপড় ঝুলছে, বেশিদামী কমদামী কোনোটারই ঘাটতি নেই। বড় লোকরা যাচ্ছে বড় বড় দোকানে, দামের দিকে না তাকিয়ে পছন্দসই শাড়ি জামা কিনে ঘ্যাঁচ করে ব্যাগ খুলে খস্ খস্ করে টাকা গুনে বিল পেমেন্ট করে দিয়ে গট গট করে এসে গাড়িতে বসছে। এইরূপ জামা কাপড়ের প্যাকেট এনে গাড়িতে তুলে দিচ্ছে স্ট্রীট বয়রা। আর আট আনা বা এক টাকা বকশিশ নিয়ে চলে যাচ্ছে।

মধ্যবিত্তদের যেতে হচ্ছে ছোট দোকানগুলোতেই, তা না হলে পোষাবে কেন? পছন্দসই হলেই তো হবে না, হিসেবের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা চাই তো? তাই অনেক খুঁজতে হয়, অনেক বাছতে হয়, আর অনেক দরাদরি করতে হয়। তাই দোকানে সময়টা অনেকখানি হাতে নিয়ে তাদের আসতে হয়।

নিম্ন মধ্যবিত্তদের আছে ফুটপাথ। নিরাপদে নিশ্চিন্তে ফুটপাথে থেবড়ে বসে পড়ে বেছে বেছে কেনে পছন্দসই জামা প্যাণ্ট আর শাড়ি।

এই শহরে কী না আছে, যা খুঁজবে তাই পাওয়া যাবে। যে যেমন তার তেমন। আজব শহর, আজব শহর এই কলকাতা। সবার জন্যে সবকিছু সাজানো আছে নিখুঁতভাবে, ফেল কড়ি মাখো তেল। সন্ধ্যের মুখে রোজই প্রায় আসে ভুলু বুলুরা ওদের মায়ের সঙ্গে। আসে এই আজব ব্যাপার দেখতে, দেখে দেখে তাজ্জব বনে যায়। বড় বড় দোকান-

গুলো আর সে দোকানে কেনাকাটার বহর দেখে দেখে বুঝি বোবা হয়ে যায়। ভাবে আর ভাবে, এদের এত টাকা কোথা থেকে আসে? এখানে যেন টাকা উড়ছে ধুলোর মতো। এখানে নেই টাকার মায়া, আছে টাকার খেলা।

রাশি রাশি জামা কাপড়ের প্যাকেট নিয়ে নামছে কত ছেলে মেয়ে আর মায়েরা এই বিরাট বিরাট দোকানগুলোর থেকে। ভাবে আর পথ চলে ওরা আধ ময়লা পোশাকে। পথের দুধারে আলোর রোশনাই এসে লাগে ওদের ম্লান পোশাকে, বেমানান লাগে সেলাই করা জামাগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠে, তবু চলে, তবু ছাখে, দেখে দেখে মন না ভরুক চোখ তো ভরে।

অনেক চলার পর একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিল টুলু আর বুলুরা। দেখছিল লোকজন, দেখছিল গাড়িগুলোর ভীড়। এমন সময় ওদের সমবয়সী কতগুলো মেয়ে হাসতে হাসতে একেবারে হুড়মুড় করে এসে পড়ল টুলু বুলুদের ঘাড়ের উপর। চোখে চোখ পড়তেই টুলু বুলু চিনে ফেলল ওদেরই পাড়ার রুমা ঝুমাকে।

একি, তোরা নাকি? ইস্, ছাখ না ভাই ইটে ঠোক্কর খেয়ে এখখুনি পড়ে যেতাম। বা-ব্বা একরাশ প্যাকেট নিয়ে কি চলতে পারি! ইস্, এই ছাখ, দুটো প্যাকেট আবার হাতের থেকে স্লিপ কেটে পড়ে গেল! প্লীজ টুলু, একটু কুড়িয়ে দে না রে। গ্যাকা সুরে কথাগুলো বলল রুমা। প্যাকেটটা কুড়িয়ে দিয়ে বুলু বলল, একটা করুণ হাসি ঠোঁটে ফুটিয়ে, এই নে, অত কথা না বললেও চলত। একটু অপ্রস্তুত হল রুমা। বলল, তোকে কষ্ট দিলাম কিনা তাই একটু বললাম।

ঝুমা বলল, তোরাও বুঝি মারকেটিং করতে বেরিয়েছিস্। ছাখ না, আমাদের মারকেটিং আর শেষ হয় না।

এক-একজনের পাঁচটা করে জামা হয়েছে। মা আবার বললেন, আরেকটা টেরিলিনের ফ্রক কিনে আন। বা-ব্বা আর পারি না—জামা-কাপড় কিনতে কিনতে হয়রান। তোরাও বুঝি মারকেটিং করতে

বেরিয়েছিস ? যা না, দেখবি ভীড়ের ঠ্যালাটা। ঝুমার কথার উত্তরে টুলু বলল, না, আমরা মারকেটিং করতে বেরুইনি। আমরা তোদের মারকেটিং দেখতে বেরিয়েছি ।

ওমা, তাই নাকি ? মারকেটিং দেখতে আবার কেউ এই ভীড়ের মধ্যে আসে ? একেবারে যাকে বলে ম্যাড্। চল্, চল্ তাড়াতাড়ি, মা গাড়িতে অনেকক্ষণ ওয়েট করছেন। যা বকা লাগাবেন না !

রুমা সবাইকে তাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল ওদের গাড়ির দিকে। টুলু বুলুর মায়ের বুকটা ব্যথায় ভারী হয়ে উঠলো, ছলছলিয়ে উঠলো করুণ চোখ হুটো।

বাড়িতে এসেই ক্লান্ত হয়ে পড়ল টুলু বুলু। গল্প চলল অনেক। আলোচনা হল রুমা আর ঝুমার।

যে-সব জামাই কিনুক আর যে যত জামাই দেখাক, টুলু বুলুর তাতে লোভ হয় না ! ফিরেও তাকায় না।

ওরা জানে.তাদের বাবার সামান্য আয়েতে কোনোরকমে পেটটা চলে। এর বেশি চলা সম্ভব নয়। তাই মুখ ফুটে ওরা জানায় না হুঃখ, মা বাবা শুনে ব্যথা পাবেন বুঝি, তাই ছোটবেলায় ওরা অতশত বুঝতো না।

ভাল ভাবে পাশ করে, রেজাল্ট হাতে নিয়ে ছুটতে ছুটতে মায়ের কাছে এসে রেজাল্ট দেখাতো। কিন্তু এ কি ? ভাল ভাবে পাশের খবরে আনন্দের বদলে মায়ের চোখে জল কেন ? এখন বোঝে ওরা— পাশ করলেই তো হবে না। একরাশ বই ! সে সব বই কেনার পয়সা কোথায় ? ওদের মা একদিন ওদের বাবার কাছে বলছিলেন, গরীবের ছেলেমেয়েদের পাশ করাও অপরাধ। কোথায় পাব বই ? পুরনো বই কেনারই বা পয়সা কৈ ? আত্মীয়স্বজনের কাছে বার বার চাইতে মাথাটা নীচু হয়ে গেছে। কথাগুলো শুনেছে টুলু বুলু কান পেতে। সেই থেকে বুঝতে পেরেছে, ওরা গরীব, খুব কষ্ট করে লেখাপড়া করে চাকরি করতে হবে। মায়ের হুঃখ 'ঘোচাতে হবে। মায়ের চোখের জল

মোছাতে হবে। মেয়েরাও তো আজ কত এগিয়ে চলেছে। যত শিখবে ততই এগোবে। ওদের মা থাকে নীরব। যে মা পারে না সন্তানদের কোনো সুখ আনন্দ দিতে, সে মায়ের বুকে বেদনার ভার চেপে রেখে বোবা হয়ে থাকা ছাড়া আর উপায় কী ?

পরের দিন ভোরবেলা টুলু বুলু পড়তে বসেছিল। এমন সময় এক-রাশ জামা এনে খাটের উপর টুলু বুলুদের সামনে রাখলো রুমা ঝুমা। টুলু বুলু অবাক হয়ে গেল, কে দেখতে চেয়েছে ওদের জামা ? রুমা এক এক করে জামাগুলো দেখাতে লাগলো। এই ছাখ ভাই এটা টেরিকটের এটা টেরিলিন, এইটা ফুল ভয়েলের। ষষ্ঠীর দিন পড়ব এইটা, সপ্তমীর দিন এইটা, অষ্টমীর দিন এইটা, নবমীর দিন এইটা। হাত দিয়ে ভাগ ভাগ করে দেখালো রুমা। তোদের কি কি জামা হল রে ? রুমার উত্তর করল বুলু, আমরা তো আর তোদের মতো বড়লোক নই যে ভাগে ভাগে জামা পরব, অত সাজগোজ আমরা ভালবাসি না। ক্লাশে বার বার ফেল করবো, আর ভাল জামা-কাপড় পরব, ওসব আমরা ভালবাসি না। বাধ্য হয়েই কথাগুলি বলে রুমাকে খোচা দিল বুলু। হাজার হোক, মানুষ তো ওরা, হতে পারে গরীব। থাকতে পারে মুখ বুজে। তবু অন্তরে কি আর সব সাধ লুপ্ত হয়ে গেছে ? তাই কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পেলে জ্বলে ওঠে। তাই বুঝি খোঁচা দেওয়া কথাগুলো না বলে পারলো না বুলু। অপ্রস্তুত হয়ে একটা ব্যঙ্গের হাসি মুখে ফুটিয়ে প্যাকেটগুলো নিয়ে চলে গেল রুমা। আর কিছুক্ষণ থাকা বা বেশী কথা বলা হল না রুমার। চলে গেলো রুমা। কিন্তু যতই বলুক মুখে, যতই সংযত থাকুক টুলু বুলু, তবুও রক্ত মাংসে গড়া দেহটা তো বটেই। তাই, মুখে প্রকাশ না করলেও বুকে চাপা রইল একটি ব্যথা। আর রইল ভগবানের উপর অনাবিল অভিমান, মনে মনে বুঝি বলে গেল—এ কি বিচার প্রভু তোমার ? শুনেছি সারা ভুবন জুড়েই তোমার সন্তান। সবার উপরেই নাকি তোমার দৃষ্টি থাকে অনুক্ষণ। সন্তান তো ভিন্ন হয় না পিতা মাতার কাছে। তবে এত কেন প্রভেদ রেখেছ

সন্তানদের মধ্যে ?

কেউ পায় অজস্র খেতে, কারো দিনান্তে এক মুঠো খেতে কুলোয় না। কেউ পরে রাশি রাশি জামা কাপড়, কারো মাত্র থাকে একটা। কেন গো প্রভু, এমন ধারা হয় ?

সত্যিই বুঝে উঠতে পারে না টুলু বুলুরা। একজনের মনে এত আনন্দ, একজন ঘুরে বেড়ায় নানা আনন্দরসে ডুবে ? আর কেউ থাকে বিমর্ষ মনটা নিয়ে ঘরের কোণে চুপটি করে বসে। সন্ধ্যেবেলা টুলু বুলুর বাবা দুটি সাধারণ ছিটের জামা নিয়ে এসে টুলু বুলুকে দিলেন ডেকে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে জামা দুটো হাতে নিল টুলু বুলু। আরো আরো একটি জিনিস আছে, এনেছি তোমাদের মার জন্যে, হাসতে হাসতে বললেন টুলু বুলুর বাবা। আনন্দে ডেকে উঠলো টুলু বুলু, মা, দেখে যাও, তোমার জন্যেও বাবা লালপেড়ে শাড়ি কাপড় এনেছেন।

মেয়েদের ডাকে মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলেন, আমার জন্যে আবার কেন ? আহা পর পর, টুলু বুলুর বাবা বললেন। সত্যিই এবার পুজো পুজো বলেই মনে হচ্ছে টুলু বুলুর। রাত্রের খাওয়া সেরে টুলু বুলু ফুটপাথে কেনা ছিটের জামা দুটো বুকে করে শুয়ে রইল, ঘুম এলো না। অনেক চিন্তার মধ্যে চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে লাগলো নানা রংএর আতসবাজীর মতো রুমা ঝুমার সুন্দর সুন্দর জামাগুলি। কত মসৃণ জামাগুলো, কত রং তাতে খেলছে ! জামাগুলোয় হাত দিতেই ভয় হয়। হাত দিলেই যদি হাওয়ায় ভেসে যায় ? ওরা পরবে। পুজোর চারটে দিন, নানা রংএর জামা ! কত কী খাবে ! গাড়ি চড়ে বেড়াবে ! কত নাম করা জায়গায় যাবে !

ওদেরই পুজো। ওদেরই মা। ওদেরই ভগবান। ভাবতে ভাবতে টুলু বুলু গরীব বাবার দেওয়া ছিটের জামা দুটোকে আঁকড়ে ধরে বুকের মধ্যে—পরম তৃপ্তিতে ঘুমিয়ে পড়লো।

বাবুজী ডাণ্ডি লেনা ? বাবুজী কাণ্ডি লেনা ? মা-জী ঘোড়ে লেনা ?

পাকদণ্ডী বেয়ে বাসটা যখন সাত হাজার ফিট উঁচু হিল-স্টেশন মুসৌরীতে এসে থামল, একদল খাঁদা খাঁদা মোটা মোটা নাদুস-নুদুস ফর্সা ফর্সা ছেলেমেয়ের দল বাসটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে শুরু করল, বাবুজী ডাণ্ডি ? বাবুজী কাণ্ডি ? লেনা মা-জী ঘোড়ে ? বাস থেকে নেমে অবাক হলাম, এই এতটুকু ছেলেমেয়ে টানবে ডাণ্ডি কাণ্ডি ?

মিসেস কাউল আমার মনের কথাটা বুঝতে পেরেই বললেন, অবাক হচ্ছেন তো ? ভাবছেন ওরা কেমন করে ডাণ্ডি কাণ্ডি টানবে, তাই না ? সত্যি, অবাক হবার কথাই। কিন্তু ওরা সব পারে, থাকুন কদিন, বুঝতে পারবেন সব কিছু। কাউলের কথায় অবাক হলাম। যদিও আমাদের ডাণ্ডি কাণ্ডি ঘোড়া কিছুই লাগেনি, তবুও ওদের দেখেই কেমন যেন মায়া লাগল। টাউনের দিকে এগোতে লাগলাম—মিসেস কাউলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে।

ছোট শহর এই মুসৌরী, রূপের তুলনা নেই। যেদিকে তাকাই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে যাই। শহরটা খানিকটা ঘুরে মিসেস কাউলের বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। ওনার বাড়িতেই থাকার জন্যে আমায় অনুরোধ করেছিলেন। তাই ওখানেই উঠতে হল। মিসেস কাউলের ওটা বাড়ি বলা চলে না। পুরো একটি সাহেবী বাংলো। বড় বড় দুখানি ঘর। ঘরের তিন পাশেই বিরাট বিরাট কাঁচের জানলা। মনে হবে পুরো ঘরটাই কাঁচের। সামনে ছোট্ট একটা পাইন আখরোটের বাগান। ঘরের লাগোয়া একটা চওড়া টানা বারান্দা। শহরের উপযোগী বাংলোটিই বটে। মিসেস কাউল নিজের প্ল্যানেই নাকি বাংলোটি করেছেন। স্বামী থাকেন দেরাদুনে। একজন বড় ফরেস্ট অফিসার। দুটি ছেলে, বড়টি

পড়ে লণ্ডনে, ছোটটি দেরাদুন কনভেন্টে।

মিসেস কাউলের আয়া মোতিয়া কফি আর স্যাণ্ডউইচ দিয়ে গেল। হাত মুখ ধুয়ে কফির পাট চুকিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম শহর ঘুরতে। বেলা তখন দশটা। দেরাদুন থেকে বাস ছেড়েছিল ভোর ছটায়। পাক্কা নটায় এসে নামলাম মুসৌরীতে।

পুজো মৌসুম, হাওয়ায় হাওয়ায় শীতের কনকনানি। আর মাস-খানেক পরেই স্নোফল শুরু হবে। সারা মুসৌরী সাদা হয়ে যাবে বরফে। স্কেটিং করতে আসবে যত আমোদী এদিক ওদিককার ছেলেমেয়ে। বেশ কনকনানি শুরু হল, ওভার-কোটটা গায়ে চড়িয়ে নিলাম। পথ চলেছি আর পথের দুধারে দোকান জমিয়ে বসা পাহাড়ী ছেলেমেয়ে ভাল করে দেখছি।

মাঝে মাঝে রাশি রাশি কালো মেঘের দল আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এক চোট ভিজিয়ে দিয়ে মজা দেখছে। ভারি মজা লাগছে। সারা দেহ মন ভিজে উঠছে, চোখ আর চশমা ভিজে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে, হাসছি আনন্দে। দেখতে দেখতে চলেছি, উঁচু-নীচু পথ বেয়ে। ম্যালে গিয়ে দাঁড়ালাম কিছুক্ষণ। আহা, যেদিকে তাকাই সুন্দর, সুন্দর আর সুন্দর। মনে হয় যেন সুইজারল্যাণ্ডে এসেছি। মুসৌরীর সঙ্গে সুইজারল্যাণ্ডের কিছুটা তুলনা করা চলে। ম্যালে ঘুরছিলাম আর দেখছিলাম এধার ওধার তাকিয়ে। হঠাৎ চোখে পড়লো ম্যালের নীচে, সারি সারি কাঠের ছোট ছোট ঘরগুলির দিকে—তারই একটা ঘরের সামনে বসে একটি গাড়য়ালি মেয়ে রুটি সেঁকছে, আর তাকে ঘিরে বসে আছে প্রায় গোটা ছয়েক সেইরকম খাঁদা বোঁচা ফর্সা ফর্সা খুদে-চোখ-ওলা ছেলেমেয়ে; হয়তো বা ওদের মা হবে, রুটি সেঁকছিল, ওরা বসে আছে একখানা রুটির আশায়।

একখানা করে রুটি সেঁকা হচ্ছে, আর ছেলে মেয়েদের পাতায় দিচ্ছে। অবশ্য ওকে রুটি সেঁকা বলে না, ঝলসানোই বলে। বড় বড় লেচি করে দুহাতে পটাপট পটাপট করে রুটি করে উনুনে ফেলছে, আর

তুলছে, বেশ বড় বড় রুটি, আর খুব মোটা মোটা।

সারা দিনে হয়তো একবারই ঐ রুটি জোটে। কোনো দিন হয়তো মোটেই জোটে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম।

ভীষণ দুঃখ হল ওদের দেখে। দেখলাম কেউ কেউ রুটি চিবুতে চিবুতেই ছুটলো বাসের স্ট্যাণ্ডে, আবার চেঁচাবে, বাবুজী, ডাণ্ডি লেনা ?

বাড়িতে ফিরলাম বেলা তখন দুটো। ফিরতে আমার ইচ্ছে ছিল না, তবু খেতে হবে, তাই যেতে হল। একটু বিশ্রামও করা চাই, আবার বিকেলবেলা বেরোতে হবে। বাড়িতে গিয়ে গরম জলে হাত মুখ ধুয়ে নিলাম। পুজো মৌসুম, তাও দারুণ ঠাণ্ডা।

তাই স্নান করা আমার চললো না।

ফিটফাট হয়ে খাবার ঘরে গিয়ে বসলাম।

মোতিয়া গরম গরম বাসমতি চালের ভাত আর মুরগীর স্টু দিয়ে গেল, আর শেষ পাতে ফ্রুট্‌স্ পুডিং। খেতে খেতে অনেক গল্প হল মিসেস কাউলের সঙ্গে। একদিনের মধ্যেই উনি আমাকে খুব আপন করে নিলেন। আমার প্ল্যান ছিল—একটা দিন আর একটা রাতের জন্য একটা হোটেল বুক করবো। মিসেস কাউল আমার প্ল্যানটা ভেস্তে দিলেন। বললেন, আরে, একটা দিন আর একটা রাতে মুসৌরীর কি দেখবেন ? অন্তত তিনটে দিন আমার কাছে থাকুন। আমার খুব সংকোচ হল, কিন্তু ওনার আন্তরিকতায় আমি এড়াতে পারলাম না ওনার কথা।

লাঞ্চ খেয়ে শীতের মিষ্টি রোদ গায়ে মাখতে বসলাম পাইন দেবদারুর বাগানে। ভারি সুন্দর লাগছিল, ঘুম আসছিল, ইজি-চেয়ারে গাটাকে এলিয়ে দিলাম। ক্লান্ত শরীর। ক্লান্ত চোখে কখন ঘুম নেমে এলো টের পেলাম না। মিসেস কাউল বসে বসে একটা ম্যাগাজিন পড়ছিলেন। আমার ঘুমটা ভাঙতে দেখি আমার গায়ে একটা সবুজ চাদর। মিসেস কাউল নেই তাঁর চেয়ারে। খুব লজ্জা পেলাম নিজের অলসতার জন্যে। উঠে পড়লাম। আমায় দেখে, কাউল বললেন, হ্যাভ এ নাইস স্লিপ ? খুব

লজ্জা পেলাম। বললাম, খুব ঘুম পেয়েছিল। আর ক্লান্তি এসেছিল। মিসেস কাউল পাতলা ঠোঁটে হাসলেন, হয়তো বলতে চাইলেন, তোমরা তো ঘুমের দেশেরই মানুষ, ঘুম আর আরামই তো সবচেয়ে বড় তোমাদের কাছে, যেটা মানুষের ক্ষতি করে বেশী।

মোতিয়া কফি আর ওমলেট নিয়ে এলো। পেটটা খুবই ভরা ছিল, তাই শুধু এক কাপ কফি খেলাম। যতই কম খাই না কেন, মিসেস কাউলের থেকে অনেক বেশীই খেয়েছি খিদের সময়। কাউল ওমলেট আর কফি খেলেন। তারপর তুজনে বেড়াতে বেরোলাম। ওঁদের বিদেশী কায়দায় চলা বলা খাওয়া শোওয়া। তাই ওঁদের স্বাস্থ্যও সুন্দর। বয়স বোঝাই যায় না। মিসেস কাউলকে দেখে সেটাই বুঝতে পারতাম। সাজসজ্জাও সভ্যভব্য, রুচিসম্পন্ন। বেরোতে না বেরোতেই শীতের সন্ধ্যে নেমে এলো মুসৌরীর সুন্দর বুকে। নীল লাল আলো জ্বলে উঠলো সারা শহরময়। এত সুন্দর লাগছিল, মনে হচ্ছিল চলে গেছি কোনো এক স্বপ্নরাজ্যে। লাল-নীল-হলুদ আলোয় ভরে গেছে সারা সুন্দরী শহর মুসৌরী।

দার্জিলিংকে লোকে বলে কিং, মুসৌরীকে বলে কুইন। কুইনই বটে। কাউল ঘুরে ঘুরে সব দেখাচ্ছিলেন, বিশেষ বিশেষ জিনিস আর জায়গা-গুলো। হিমালয়ান ক্লাবে বিলিতি ব্যাণ্ড বিলিতি জ্যাজ বাজছিল। দারুণ ভাল লাগছিল সারা শহরের সব কিছু মিলিয়ে। চলতে চলতে চলে এলাম ম্যালে। নির্জন শান্ত ম্যাল, এক রকম আমিই নিয়ে এলাম মিসেস কাউলকে এই নির্জন ম্যালে। খুব ইচ্ছে হচ্ছিল আবার সেই বাচ্চাগুলোকে দেখি, রাতের অন্ধকারে ওরা কি করে? ম্যাল থেকে সেই নীচে চোখে পড়লো সেই ঘরগুলি। ডিমডিমিয়ে আলো জ্বলছিল ঘরে ঘরে। সেই খাঁদা খাঁদা ছেলেমেয়েগুলো আবার সেই রকম ঘিরে বসে আছে ওদের মাকে। আবার সেই রুটি পাকানো হচ্ছে।

আরো নীচের গ্রাম থেকে ভেসে আসছে অনেক বাচ্চা গলার গান। কত আনন্দ যেন ওদের মনে! রাত্রে ছোটরা ডাণ্ডি কাণ্ডি টানে না,

তাই ওদের ছুটি। ওদের মনভরা আনন্দ দেখে অবাক লাগে! শীতের দেশ, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়ে, ওদের গায়ে ছেঁড়া ছেঁড়া কোট একটা করে, পায়ে দড়ির বা ঘাসের জুতো আর মাথায় একটা করে কাপড়ের টুপী। ব্যাস! আর খাওয়ার দুঃখের কথা বলার নয়। পেট ভরে খাওয়ার কথা ওরা ভাবতেই পারে না। তবে আনন্দে ওদের মন ভরপুর। ডাণ্ডি কাণ্ডি টানবার সময় ওদের মুখের অবস্থা দেখলে চোখে জল আসে, মুখগুলো লাল জবার মতো টকটক করে, শরীরে কত কষ্ট হয়! তবু ওদের বিরক্তি নেই, হাসিখুশি মুখ।

মাঝে ক্লান্ত হয়ে পাহাড়ের গায় সবুজ ঘাসে হেলান দিয়ে শুয়ে শুয়ে খুব গান গায়, তখন মনে হয় কত সুখী ওরা! শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম ওদেরই। পাহাড়ী দেশের ছেলেমেয়ে. পাথরের মতো ঠাণ্ডা ওদের দেহ আর মন। কিছুতেই পরোয়া নেই। কে ভাল খাচ্ছে, কে ভাল পরছে, তা দিয়ে ওদের দরকার নেই। সারা দিনে রাতে দুখানা রুটি পেলেই ওরা খুশী। তবে শুনলাম, বরফ পড়া শুরু হয়ে ওদের আরো কষ্ট। যাত্রী আসে কম, আর সারা শহর বরফে ডুবে যায়। তখন ওদের কিছু লোক গরু ভেড়া ছাগল নিয়ে নীচে নেমে যায় দেরাদুন কিংবা অন্য দেশে।

ম্যালের দৃশ্য দেখতে দেখতে আর চলতে চলতে এসে পড়লাম আবার শহরে। মিসেস কাউল ঘড়ি দেখে বললেন, আটটা বাজলো, এবার ফেরা যাক। আস্তে আস্তে দোকানপাট সব বন্ধ হবে। নিঝুম হয়ে ঘুমিয়ে পড়বে সুন্দরী মুসৌরী। শুধু দূর গ্রাম থেকে ভেসে আসবে ক্লান্ত পাহাড়ী-দের গানের সুর। আর রাতের আকাশের ঠাণ্ডা মেঘগুলো আসা-যাওয়া করবে বার বার।

উঃ খুব ঠাণ্ডা। ওভার কোটের ওপর ঝিরঝিরিয়ে বরফের গুঁড়ো ঝরছে। মোজা-পরা পা দুটোও যেন অবশ হয়ে যাচ্ছে। বাড়িতে গিয়ে বসতেই মোতিয়া গরম গরম কফি নিয়ে এলো। মোতি বহুদিনের লোক। আগে ঘোড়া টানতো, কাণ্ডি টানতো। অত ভারি কাজ হয়তো আর

পারত না, তাই কাউলের কাছে কাজ চেয়েছিল, সেই থেকেই রয়ে গেছে। এখন বয়স ষাটের কাছাকাছি কিন্তু বোঝার উপায় নেই।

ডিশ-ভরা ডিনার এলো, তবে সবাই হাল্‌কা খাবার। আমার মনটা বাচ্চাগুলোর জন্যে কেঁদে উঠলো। সরল সহজ শিশুগুলোকে ঈশ্বর তুমুঠো পেট ভরে খেতে দেন না, কি অপরাধ করেছে ওরা? মনে হল, আমি যদি মিসেস কাউলের মতো হতাম তাহলে ওদের জন্য নিশ্চয়ই কিছু ব্যবস্থা করতাম। আমার অবস্থা দেখে মিসেস কাউল বললেন, এ কি! আপনি তো কিছুই খেলেন না! আপনাদের দেশের লোকরা তো কত রকম রান্না জানে, খেতেও ভালবাসে। আপনি কেন খাবেন না। এত রাস্তা হেঁটে এলেন, নিশ্চয়ই খিদে পাবে। অত বলার পর একটা স্যাণ্ড-উইচ আর একটা ফিস ফ্রাই খেয়ে মিসেস কাউলকে খুশী করলাম। উনি ডিশের সব কিছু খেয়ে উঠলেন।

কিছুক্ষণ গল্পসল্প করে আবার এক কাপ কফি খেয়ে শুয়ে পড়লাম। তু ঘরে তুজন। আমার ঘুম এলো না, কাঁচ-মোড়া জানলার মোটা রঙিন পর্দাটা একটু সরিয়ে দেখতে লাগলাম সুন্দরী মুসৌরীর রূপ। সাত হাজার ফিট উঁচুতে একটা সুন্দর ঘরে ডানলোপিলোর গদিতে শুয়েও ঘুম এলো না অনেকক্ষণ। কোথায় যেন পাহাড়ী গান হচ্ছে। তুঃখে-ভরা জীবনে এই রাতটুকুই আনন্দপূর্ণ। সারাদিনের ক্লান্তিটা ভুলে থাকে ওরা কিছুটা সময়। সঙ্গে অদ্ভুত একটা বাজনা বাজছে। শুনতে দারুণ ভাল লাগলো। চুপ করে দেখতে লাগলাম আর ওদের গান শুনতে লাগলাম। রাতে ঘুমিয়ে পড়েছে সেই বাচ্চাগুলো। ভোর থেকে উঠেই লেগে যাবে কাজে। পেটের জ্বালায় চেঁচাবে ডাণ্ডি লেনা মাতাজী, ঘোড়ে লেনা! ওদের মা বাবাও কাজে লেগে যাবে ভোর না হতেই।

ভাবতে ভাবতে কখন চোখে ঘুম এসে গিয়েছিল জানি না। চোখ মেলেই দেখি, পর্দার ফাঁক দিয়ে এক ফালি রোদ এসে পড়েছে আমার গায়ে। মোতিয়া ভারি ভারি পর্দাগুলো সরিয়ে দিয়ে গেল। আমি মুখ ধুয়ে এসে মুসৌরীর ভোরের রূপ দেখছিলাম। দেখলাম, বাচ্চাগুলো

এর ওর গায় হাত রেখে ঝুঁকে ঝুঁকে উপরে উঠছে আর নীচে নামছে। আমাদের সেদিন ফেরার দিন, বেলা দশটার বাসে আমরা দেরাদুন ফিরবো, আমার লাগেজ গুছিয়ে নিলাম। দেরাদুন বাস স্ট্যাণ্ডে অপেক্ষা করতো দেরা, মহুয়া আর পম্পা, মেয়েরা। কিন্তু ওরা জানে না আমি কবে ফিরছি।

আবার সেই একরাশ বাচ্চা প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে, বাবুজী ডাণ্ডি লেনা, একটা বাচ্চা একেবারে আমার কোলের কাছে এসে করুণ মুখ করে দাঁড়ালো। আমি চট করে ব্যাগ খুলে কিছু পয়সা মুঠো করে দিয়ে দিলাম। মনে নেই, টাকা খানেকের মতই হবে, ও অবাক হয়ে একবার হাতের পয়সাগুলো দেখছে আর একবার আমার মুখের দিকে দেখছে। আমি ওর মজা দেখে হাসতে লাগলাম। তখন ও নিজেও খুব হাসতে লাগলো। তারপর পয়সাগুলো পকেটে পুরে আমাকে একটা সেলাম করে দৌড় লাগলো। আমরা বাসে উঠলাম। যতক্ষণ বাসটা ছাড়েনি, ততক্ষণ বসে বসে দেখছিলাম ওদের মজা। ওরা কেমন মজা করছিল, কখনো এক জায়গায় বসে গান করছে, কখনো জড়াজড়ি করে পাহাড়ের গায়ে গড়াচ্ছে, কখনো ছুটোছুটি করছে। কি সুন্দরই লাগছিল ওদের! ভাবছিলাম এমন ফুটফুটে ছেলেগুলো যদি খেতে পেত আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে পারতো তবে কতই না সুন্দর হতো!

বাসটা ছেড়ে দিল, বাচ্চাগুলো ফুলো ফুলো হাত নেড়ে নেড়ে আমাদের বিদায় জানালো। বাসটা একটু নামতেই কানে এলো, বাবুজী ডাণ্ডি লেনা, বাবুজী কাণ্ডি লেনা? আবার নতুন যাত্রীর আনন্দে হয়তো মেতে উঠলো। দারুণ উল্লাসই।

ছোড়দির এক্সপেরিমেণ্ট

ছেলেবেলায় আমার দুটি বোনঝি শেফালি বিজলী আর আমার এই তিনজনের জীবনটা ছোড়দির হাতেই একরকম ছেড়ে দেওয়া ছিল। মা ছিলেন খুব শান্তিপ্রিয়। একেই বাড়িতে গণ্ডা দুয়েক চাকর ঝি আর ঠাকুরকে চালাতেই মা অস্থির হতেন, তারপর ছিল গরুবাছুর। তারপর অতিথি অভ্যাগত লেগেই থাকতো বাড়িতে। হাতে কাজ না করলেও মার সময় ছিল না সারাদিনে। সুতরাং আমাদের সব দায়িত্ব ছোড়দিই নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছিল। আমাদের চলাফেরা, পড়াশোনা, খাওয়া-শোওয়া এই প্রতিটি জিনিসের উপর ছিল ছোড়দির সতর্ক দৃষ্টি।

কাজেই আমাদের তিনটি মাসী বোনঝির যা কিছু দায়-দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল আমার থেকে নয় বছরের বড় ছোড়দিদিটির উপর। ছোড়দি যা বলত আমাদের সেটা শুনতে হত। সে ভালই হোক আর খারাপই হোক। অবশ্য কোনো অন্যায়ের প্রশ্রয় দিত না। যেমন ছিল ছোড়দির স্নেহ ভালবাসা, তেমনি ছিল তার শাসন। কলকাতা থেকে বড়দি সুদূর পাহাড়ী পল্লী গিরিডিতে মামার বাড়িতে মাসীর হেপাজতে দুটি মেয়ের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলের আশায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আর পাঠিয়ে বিরাট সংসারে বড়দি খুবই নিশ্চিন্ত ছিলেন। আমাদের এই তিনটি অনুর্বর মস্তিষ্ককে উর্বর করে তুলতে চেষ্টার ত্রুটি করেনি ছোড়দি। একটা কবিতাকে সাত বার পড়েও যদি না মুখস্থ হত তবেই ছোড়দি বলতো মাথায় ঘুঁটে ঠক্ঠক্ করছে। লেখাপড়া কিস্‌সু হবে না, মাঠে গিয়ে ঘাস খাওগে যাও। ছোড়দির কথাটা কিছুটা মিলেছে। মাঠে মাঠে ঘাস খেতে হচ্ছে না বটে, কিন্তু আধা গরু বনেই রইলাম। গিরিডির ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে আমরা পড়তাম। ছোড়দি ছিল সব টিচারদের প্রিয়। আমাদেরও খুবই স্নেহ করতেন

সবাই। তবে ছোড়দির যেমন ছিল গুণ তেমনি ছিল রূপ, তাই প্রত্যেকেই বিশেষ চোখে দেখতেন তাকে। ছোড়দি আমাদের জামা নিজে বানাত। সে নানা ডিজাইনের ফ্রক পরেছি আমরা ছোড়দির হাতের। স্কুলে আরো দাম চড়তো ছোড়দির ওসব গুণপনা দেখে। ছোড়দি আরো ফুলে যেতো। এটা খুব সত্যি কথা, আমাদের বাবা মা আর দিদি-দাদারা খুবই সুরুচিসম্পন্ন ছিলেন। বাবার ছয় বিঘা জমির উপর বাড়িটি দেখে যে কোনো রুচিসম্পন্ন লোক বাহবা দিতেন। বাবা কলকাতা গেলেই ছোড়দির জন্যে ফ্রকের ক্যাটালগ নিয়ে আসতেন, আর মহানন্দে আমার ছোড়দি আমাদের ফ্রকের উপর এক্সপেরিমেন্ট চালাতো। কিসে আমাদের সুন্দর দেখাবে সেই দিকে ছিল তার সতর্ক দৃষ্টি। তবে বলার কিছু ছিল না, যা করবে, তাই মেনে নিতে হবে। নতুন জামা পরিয়ে আমাদের স্ট্যাচু করে রাখতো, কোথায় কি খুঁত হল, দেখতে দেখতেই আধঘন্টাখানেক সময় চলে যেতো, একটু নড়বার-চড়বার উপায় থাকতো না। নড়লেই বলতো হাত পা চুলবুল করছে না? এক চাঁটা মারবো। অগত্যা নট নড়নচড়ন। কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকতাম। ছোড়দি নির্বিবাদে এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে যেত আমাদের উপর দিয়ে।

বড়দা মেজদা আর সেজদা থাকতেন কলকাতায়, ছুটিছাটা পেলে মেজদা সেজদা না এলেও বড়দা চলে আসতেন হুট করে, বেশ ঘনঘনই আসতেন বড়দা। মার উপর ছিল দারুণ টান, তা ছাড়া গিরিডির বন পাহাড় আর উশ্রী নদী আকর্ষণ করত তাঁকে বার বার। বড়দা ভাই-বোনদের খুব ভালবাসতেন, বিশেষ করে আমাকে। বাড়ির মধ্যে সবার ছোট হিসেবে আমার আদর আর আব্দারটা ছিল খুব বেশি। গিরিডিতে এলেই এখানে-ওখানে যাবার প্রোগ্রাম ঠিক হয়ে যেতো। আনন্দের সীমা ছাড়াতাম। কিছুদিন থাকলেই বুঝতে পারতেন ছোড়দির ব্যাপার-স্যাপার। হেসে গড়িয়ে পড়তেন দেখেশুনে। একদিন বড়দার সামনেই ছোড়দি একটা ফ্রক সেলাই করে আমাকে পরালো। জামাটা পরিয়ে বার বার দেখতে লাগলো, নড়বার উপায় নেই, চুপচাপ দাঁড়িয়ে

রইলাম গাল ফুলিয়ে। বড়দা খুব হেসে বললেন, তুই আচ্ছা দরজী হয়েছিস তো দেখছি, এক ঘণ্টা তো শুধু জামা দেখতেই কাটিয়ে দিলি! আমি মনে একটু সাহস পেলাম। বললাম, জামাটা কি ঠিক হয়েছে নাকি, ঝুলটা তো ছোট বড় হয়ে গেছে। ছোড়দি চোখ পাকিয়ে বলল, চুপ কর, হাত পাকবার আগে অমন হবেই। ছোড়দির দোষ ধরবার উপায় ছিল না। ভাবতাম, আর কত হাত পাকাবে বাবা, হাত পাকাতে পাকাতে তো বুড়ো বনে যাবে! ছোড়দির যখন যা মনে হত তখনই তা করে ফেলতো।

আমাদের মাঠে চারজন এ্যাংলো ইনডিয়ান মেয়ে খেলতে আসতো। বড় দুটি মেয়ের নাম ছিল, এথেল আর হিল্ডা, ছোট দুটির নাম ছিল ডলি আর বেবী। এথেল হিল্ডা ছিল ছোড়দির বন্ধু, ডলি বেবী ছিল আমার বন্ধু। ওরা নিয়ে আসতো দুটো পনি। মাঝে মাঝে ডলি বেবী পনি চড়ে ঘুরে বেড়াতো। আমাকেও চাড়তো। ওদের চুলগুলো ছিল খুব সুন্দর। বব্ হেয়ার। ওদের রোজ দেখে দেখে ছোড়দির মাথার পোকাটা নড়ে উঠলো। সেদিন ছিল রোববার। জলখাবার খেয়ে সবে উঠেছি। ছোড়দি আমায় হাত ইশারা করে ডাকলো চাতালের এক কোণায়। যেতেই দেখি সব রেডি। বড় কাঁচি, ছোট কাঁচি, কাগজের জামা, সব রেডি। হায় ভগবান, এইবার আর রক্ষে নেই! হাড়িকাঠে পাঁঠার গলাটা পড়লো বলে। দেখে শুনে আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করলো। খুব আদর যত্ন করে আমায় বসালো। আমি জানতাম আমার অবস্থাটা কি দাঁড়াবে। তাই আমি বেশ আপত্তি জানালাম, কিন্তু আমার কোনো ওজর আপত্তি খাটলো না। আমাকে বসতেই হল মাথাটা নীচু করে। কাগজের জামা পরে মাথাটাকে ছোড়দির হাতে ছেড়ে দিয়ে বসে রইলাম। শুরু হল বব্ ছাঁটের এক্সপেরিমেন্ট। উঃ, সে কি অবস্থা, মাথা কন কন ঘাড় টন টন, তবু আর মুক্তি নেই। মাথাটা একটু নড়াবারও উপায় নেই। রাগে আমার কান্না এসে গেল। ভাবলাম, কবে যে ছোড়দিটার বিয়ে হবে, আর কবে যে শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে, আর কবে যে ওর হাত

থেকে মুক্তি পাব তার ঠিক নেই। উঃ, মাও যেন বোবা হয়ে থাকেন, দেখে শুনে শুধু হাসেন। আমার একটু দোষেই শাসন করবেন, ছোড়দির অন্যায় যেন অন্যায়ই নয়! দারুণ রাগ হল। বললাম, আর আমি পারছি না, এবার ছাড়ো। দাঁড়া দাঁড়া, একটু বোস, কাল দেখবি সবাই তোর চুলের কায়দা দেখে কত ভাল ভাল বলবে। মনে মনে বললাম, আমাকে কেউই ভাল বলবে না, ভাল বলবে ছোড়দিকেই। আমার অবস্থাটা যে কি হচ্ছে তা আর কে বুঝবে! ক্রেডিটটা পাবে ছোড়দিই। স্কুলের মিস্‌রা সবাই ছোড়দিরই জয়গান গাইবে। ঐ জয়গানের জন্যে যে আমার কতখানি যন্ত্রণা সেটা আর কে বুঝবে! নিজের জয়গানের জন্যেই এত কায়দা।

প্রায় ঘন্টাখানেক আমায় ঘাড় মটকে থাকতে হল। ছোড়দা একবার দেখে বলল,'কি করছিস কি তুই, মেয়েটার ঘাড়টা যে গেল, খুব হয়েছে বাবা, এবার ছাড়। আর ছাড়, কে কার কথা শোনে! কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত দয়া মায়া নেই। চোখের জল পড়ে পড়ে কাগজের জামাটা ভিজে ন্যাতাই হয়ে গেল। এক সময় মুক্তি পেলাম আমি। উঃ, ঘাড়টা এমন টনটনিয়ে গেছে যে ঘাড় ফিরোতে পারছি না। দ্যাখো তো কেমন হয়েছে? ছোড়দি ডেকে ডেকে দেখাতে লাগলো। সবাই ছোড়দির প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আর ঘাড়ের ব্যথায় আমি ঘাড় ফেরাতে পারছি না। কে আর বুঝবে আমার অবস্থাটা তখন! ছোড়দিকে খুশী করার জন্যই হয়তো সব্বাই বার বার বলতে লাগলো, আমার চেহারাটা নাকি এক্কেবারেই বদলে গেছে বব্‌ ছাঁটের জন্যে। বলার আর কিছু রইল না। চলো এবার বাথরুমে স্নান করতে। হায় ভগবান! এক হাড়িকাঠ থেকে আরেক হাড়িকাঠ। প্রতিবাদ করলাম, না, তোমার হাতে স্নান করবো না। আমি একা একা স্নান করবো। মা অমনি বলে বসলেন, না, একা একা স্নান করা ভাল হয় না। ছোড়দি ভাল করে স্নান করিয়ে দেবে। অগত্যা ছোড়দির পিছু পিছু বাথরুমে ঢুকতে হল। আধ ঘন্টা হবেই, যখন বাইরে বেরুলাম আমার গা হাত মুখ জ্বালা করতে

লাগলো। এমন ঘষাই ঘষেছে। মা সারা মুখে ক্রীম লাগিয়ে দিতে জ্বালা একটু কমলো। শেফালি বিজলী বললো, আমরা নিজেরাই স্নান করবো, তোমায় করাতে হবে না। বাব্বা যা ডলা তুমি ডলো, বলেই খুব হাসতে লাগলো। না ডলবে না, এক গা ময়লা নিয়ে ঘুরে বেড়াবে। তা থাক, আমরা তোমার কাছে স্নান করছি না বাবা। বললো শেফালি বিজলী। অগত্যা ছোড়দি হাল ছাড়লো। নিজেই স্নান করতে গেল ছোড়দি। যাবার আগে তর্জনী নেড়ে বলে গেল, কালই তোমাদের কলকাতায় পাঠানোর ব্যবস্থা করছি, দাঁড়াও।

আমি স্নানপর্ব সেরে রোদ্দুরে একটু বসেছিলাম, ঘাড়ের টনটনানিটা একটু কমাচ্ছিলাম। ছোড়দি স্নান করে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আমায় ও-ভাবে বসে থাকতে দেখে বললো, কি হে, আয়নায় মুখখানা দেখেছ? খুব তো কান্না হচ্ছিল। ছোড়দি তোমাদের ভাল করতে চাইলে খারাপ হয়, না? এবার সবাই তোমাকেই তো দেখবে। আমি কান্না-ধরা গলায় বললাম, আহা, ভাল তো তোমাকেই বলবে, আমার কষ্টটা তো কেউ বুঝবে না। বেশী পাকামো করিস না, চল খেতে চল। ও দুটো শয়তানী কোথায় গেল? ওরা তো স্নান করে চুল আঁচড়াচ্ছে, বললাম আমি। হায় ভগবান! দু মিনিটে স্নান শেষ! পেত্নী পেত্নী! ছুটির দিনে যে একটু ভাল করে স্নান করাবো সে হবে না! ছোড়দি বলতে বলতে ঘরে ঢুকলো। বুঝলাম, ছোড়দির রাগ হয়েছে। কারো সঙ্গে ভাল করে কথা বলবে না আজ। শেফালিটা ছিল ভীষণ জেদী, একটু রাগ হলেই ফলসা গাছে গিয়ে উঠে বসতো। অনেক সাধ্য সাধনা করে তাকে নামানো হত। ছোড়দি তবু ওকে ভালবাসতো বিজলীর থেকে। বলতো, ওটা ডানপিটে হতে পারে, তবে খুব সরল সোজা। শেফালি আমার থেকে এক বছরের বড় ছিল, বিজলীর থেকে দু বছরের। সুতরাং আমাদের থেকে শেফালির মানটা ছিল একটু বেশী। ছোড়দি ওর সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করতো। যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় শেফালিকে নিয়ে যেতো ছোড়দি। আমরা দুজনে বাতিল হতাম। একবার আমাদের

দারুণ অভিমান হলো ছোড়দির উপর আর রাগও হলো শেফালির উপর। আমাদের স্কুলের পণ্ডিত মশাই মারা গেলেন, খবর পেয়ে মা আগেই চলে গেলেন। একটু পরে ছোড়দি শেফালিকে নিয়ে চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল, তোমরা স্নানটান করে সময় মত খেয়ে নিও, শোকের বাড়ি যাচ্ছি কখন ফিরবো তার ঠিক তো নেই। বিজলি ঝাঁ করে বলে বসলো, তা ওকে নিয়ে চলেছ কোথায়? ওকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, ছোড়দি বললো। বা-রে, আমরা যাবো না বুঝি, দেখবো না বুঝি আমাদের পণ্ডিত মশাইকে! বিজলি বললো। তোরা ছোট না? ভয় পাবি দেখলে। আয় রে শেফালি, বলে শেফালিকে নিয়ে ছোড়দি চলে গেল। আমরা হাঁদার মত পড়ে রইলাম। ছোড়দি শেফালির মত জেদা মেয়েকে বশ করেছিল ভালোভাবেই, যাতে নানা রকম এক্সপেরিমেণ্ট চালাতে পারে ওর উপরেও। ওদের চুলগুলো খুব লালচে ছিল। ছোড়দির ইচ্ছে ছিল ন্যাড়া করে ছায়, কিন্তু কথাটা প্রকাশ করে ফেললে আর উপায় নেই। তাই মনে মনেই ছোড়দা আর ছোড়দি প্ল্যান করতো।

গ্রীষ্মের ছুটি পড়েছে, বিহারের দুরন্ত ফুটিফাটা গরম, অথচ হাওয়া বইতো সারাদিন। এদেশের মত প্যাচপ্যাচে ভ্যাপসা গরম ওদেশে হয় না। দুপুরবেলা রোজ আমাদের ছুটির টাস্ক করাতো ছোড়দি। নিজেও পড়তো, আমাদেরও পড়াতো। খেয়েদেয়ে আমি মধ্যের বারান্দায় ইজি-চেয়ারে বসে আছি। দেখছি সামনের বকুল গাছটায় ছুটো বুলবুলি বসে গাল ফুলিয়ে ফুলিয়ে বকুল খাচ্ছে। হাওয়ায় দুলছে বকুলের ডালগুলো। সবার খাওয়া শেষ, রান্নার ঠাকুর ভিক্ষারী দোবে খাওয়াদাওয়া সেরে রান্না ঘরের বারান্দাটায় বসে খইনি টিপছিল। আর ঢেঁকিঘরে বসে বুড়ী দাই তামাক খাচ্ছিল। বসে বসে দেখছিলাম, চোখ দুটোতে ঘুম নেমে আসছিল, গ্রীষ্মের ক্লান্তিতে। শেফালি বিজলি কোথায় গেছে কে জানে। মা শুয়ে পড়েছেন। ছোড়দা বই পড়ছে শুয়ে শুয়ে। বড়দা গেছেন বন্ধুর বাড়ি নিমন্ত্রণ খেতে। হঠাৎ মাথায় একটা ছোট্ট চাঁটি মেরে ছোড়দি বললো, এই, আয়। আমার তখন জোর ঘুম এসেছে। ভাবলাম, এক ঘুম

না দিয়ে উঠছি না বাবা। যদিও আমাদের পড়ার ঘরটা ছিল খুব সুন্দর। ঘরের পাশেই ছিল যুঁই আর বেল ফুলের গাছ। ফুলগুলি উঁকি মারতো জানলা দিয়ে। ফুলের উপর উড়ে এসে বসতো যত সুন্দর সুন্দর নানা রংএর পাখি। পড়ায় মন বসতো না। মনটা উদাস হয়ে যেত ফুলের গন্ধে। উদাসী মন নিয়ে পড়ায় মন বসে না, ছোড়দি সে কথাই বলতো। ছোড়দির জন্যে আমার মনটা কেমন যেন লাগতো, এই দুরন্ত গরমেও বেচারীর বিশ্রাম নেই, আমাদের নিয়ে খেটেই চলেছে। তাই ভাবছিলাম, ছোড়দি একটু বিশ্রাম করুক, তারপর যাচ্ছি। পড়তে বসলে আর ছোড়দির বিশ্রাম হবে না।

ও হরি, যা ভেবেছিলাম তা মোটেও না। আবার এক্সপেরিমেন্ট, এবার কৃপা হয়েছে শেফালির উপরে। এবার সেই ডানপিটে শেফালির উপর। এবার বব ছাঁট নয়, হেয়ার কারলিং। দরজার ফাঁক দিয়ে আমি আর বিজলি দেখছিলাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, চোখগুলো আমড়ার আঁটির মত বড় বড় করে। ব্যাপারটা চট করে বুঝে নিতে দেরী হলো না। সেই এ্যাংলো মেয়েদের কাছ থেকে হেয়ার কারলিং শিখে নিয়েছে ছোড়দি কোন ফাঁকে। ওদের কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলো দেখে ছোড়দির যে খুব লোভ হয়েছিল সেটা আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। তবে এমন দুঃসাহসিকতার কাজ যে করে ফেলবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। ছোড়দির কানে কে যে মন্ত্রণা দিয়েছিল—লোহার কাঁটা গরম করে চুল-গুলি ঐ কাঁটায় পেঁচিয়ে রাখলেই চুল কোঁকড়া হবে। মাথার পোকাটা বোধ হয় কিল্‌বিল্‌ করে উঠলো, যাহা ভাবা তাহা কাজ। শুরু হল এক্সপেরিমেন্ট। ছোড়দির একটা উলের কাঁটাকে আচ্ছা করে পুড়িয়ে শেফালির চুলের আগা থেকে কিছুটা পর্যন্ত পেঁচিয়ে ধরলো, আমরা দেখলাম। ওর চুলের কাজটা সফল হলেই আমরা এগুবো ঠিক করলাম। কিন্তু কী সর্বনাশ! চুল পোড়ার গন্ধ আসছে, আমরা ভিতরে ঢুকে পড়ে বললাম, শেফালির চুল পুড়ছে যে।

আমাদের বুক ঢিপ ঢিপ, চোখ গোল গোল। ছোড়দি বেশ নির্ভিক

স্বরে বললো, চিল্লাস না, পুড়লেই হলো না ?

এর মধ্যে মা আর ছোড়দা এসে হাজির, সারা বাড়ি চুল পোড়া গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে, চুল পোড়া আর মড়া পোড়ার গন্ধ অনেক দূরের থেকে নাকে আসে আমরা তা জানতাম। কি পুড়ছে কি পুড়ছে রে, মা ব্যস্তত্রস্ত হয়ে আমাদের পড়ার ঘরে ঢুকলেন, সঙ্গে ছোড়দাও। ছোড়দি তখনও তার এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা সবাই লক্ষ্য করলাম, মাটিতে পড়ে আছে শেফালির পোড়া চুলের গুচ্ছ। সর্বনাশ !

ওকে কি পুড়িয়ে মারবি না কি বুবু, ছাড় ছাড়, মেয়েটার চুলগুলো সব পুড়িয়ে দিলি ? তুই যে কি করিস বুবু—বলেই মা খুব হাসতে লাগলেন।

ছোড়দা বললো, কেলেঙ্কারী, দোহাই বাবা, তোর আর এক্সপেরিমেন্টের দরকার নেই, ক্ষ্যান্ত দে।

আমারও খুব রাগ হলো, সুযোগ পেয়ে বললাম, চুল কোঁকড়া হচ্ছে, পুড়িয়ে ঝুড়িয়ে একাকার। জানে না তবু করা চাই। শেফালিরও তখন চোখে জল, ভাবলো হেয়ার কারলিং করতে হেয়ারই পুড়ে গেল। ছোড়দি কিন্তু ঘাবড়াবার মানুষ না, বলল, আহা এমন কি হয়েছে ? প্রথমেই তো আর হাত পাকে না।

সে কি কথা—তাই বলে কি তুই লোকের চুল পুড়িয়ে হাত পাকাবি নাকি ? মা হেসেই অস্থির এমন কাণ্ড দেখে।

বিজোল বললো, চল রে শেফালি আমরা কালই কলকাতায় চলে যাব।

ছোড়দি ওর মাথায় এক চাঁটি মেরে বললো, যা না, কাল কেন আজই যা না। আমার কাছে থাকলে আমার কথা শুনতে হবে।

ছোড়দা বলল, আর চুল ফুল কারলিং করে দরকার নেই। কালই ঐ দুটোর মস্তক মুণ্ডন হবে।

আরো কিছু না, আমাদের এখানে এসে যা খুসি তাই করবে তোমরা না ? বড় বড় গোল চোখ দুটো পাকিয়ে বললো বিজলী।

ওদের দুজনেরই গোল চুলগুলি ভারি বিশ্রি ছিল। সুন্দর চুলের আশায় জোর করেই ছোড়দি আর ছোড়দা ওদের মস্তক মুণ্ডন করেই ছেড়েছিল। তবে সেই থেকে ছোড়দি আমাদের উপর আর এক্সপেরিমেণ্ট চালায়নি। ছোড়দি আমাদের ছেড়ে থাকতে পারতো না, অনেক যত্ন দিয়ে আমাদের মানুষ করেছিল, আমরাও ছোড়দি না থাকলে অন্ধকার দেখতাম। সেই ছোড়দি একদিন আমাদের ছেড়ে অনেক অনেক দূরে স্বর্গরাজ্যে চলে গেল। কাঁদলেও আর পাব না আমার ছোড়দিদিকে। পাব না আর দেখতে। পাব না অমন স্নেহমাখা ডাকটি শুনতে। অতীতের ফেলে আসা স্মৃতিগুলি মনে পড়লেই আগেই মনে পড়ে আমার বড় প্রিয় দিদি, ছোড়দিকে।

কিপ্টে বুড়ি

হাঁসপুকুর গ্রামটা দেখতে যেমন সুন্দর, লোকগুলোও তেমন ছিল সোজা সরল ভালো। সবাই খেটে খাওয়া মানুষ, ডাল ভাত যা জুটতো মনের আনন্দে খেয়ে দিন কাটাতো। সবার আপদে বিপদে সবাই সবার দেখাশোনা করতো। জেলে, জোলা, চাষী, কুমোর সবাই বাস করতো পাশাপাশি। গ্রামের এক ধারে থাকতো এক বুড়ি আর এক বুড়ো। ছেলেপুলে ছিল না বুড়ির। ছিল একটা গরু আর দুটো ছাগল। বুড়ি গরু আর ছাগলের দুধ বেচে বেশ পয়সা করতো। যা রোজগার করতো বুড়োকে জানাতো না। বুড়োর নিজের বলতে ছিল দুখানা মাটির ঘর আর একফালি জমি। জমিতে বুড়ি পুঁতেছিল কচু একরাশ, আর শাক-সবজী। বুড়ি ছিল বেজায় কিপ্টে। নিজে লুকিয়ে চুরিয়ে ভালোটা মন্দটা খেত, বুড়োটাকে খুব কষ্ট দিত খাওয়ায়। কচু ঘেঁচু খাইয়ে খাইয়ে বুড়োর দফা রফা করে দিয়েছিল। বলার উপায় ছিল না, বুড়ো যখন রোজগার করতো, তখন বুড়ো নিজে বাজার করতো, এটা ওটা খেত। শেষের দিকে বুড়ো আর কাজকর্ম করতে পারতো না। বুড়িও খেতে দিত না।

বুড়োর সকাল বিকেল বড় খিদে পেত, তাই যেত গ্রামের বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে, বসে গল্পসল্প করতো আর মুড়িটা, চিড়েটা খেয়ে পেটের জ্বালা মিটাতো। বুড়োর জন্যে সবার ছিল খুব দুঃখ। দুধ বেচা ছাড়াও বুড়ির জমানো কিছু সোনাদানা ছিল বুড়ির বাপের বাড়ির থেকে পাওয়া। সে সব বুড়ি মাটির নীচে লুকিয়ে রেখেছিল, বুড়োও জানতো না। একদিন খেতে বসে কান্না পেল, বলল, বুড়ি—এ দুনিয়ায় কি আর কিছু মেলে না এই কচু ঘেঁচু আর কুমড়ো ছাড়া, খাবারটা একটু বদলা না, একটু খেয়ে বাঁচি। বুড়ি ট্যারা চোখে তাকিয়ে থেকে বলল, ট্যাকা আন না, দেখবি রাতারাতি সব বদলে যাবে। বাজারের

ভালো ভালো মাছ তরকারি এসে যাবে। পেট পুরে খাবি। বুড়ো অনেক করে কান্নাটা সামলে নিয়ে বড় বড় দলা করে কচু আর কুমড়োর ঘ্যাঁট মাখা ভাত কোনো রকমে গিলে উঠে পড়লো, আর কথা না বলে। বুড়ো খেয়ে বাড়িতে থাকতো না, গ্রামে ঘুরতে যেত। বুড়ো চলে গেলেই বুড়ি চুনো মাছের ঝাল দিয়ে বেশ করে ভাত মেখে খেত পা ছড়িয়ে বসে। বুড়ো মাঝে মাঝে ঘরে মাছের গন্ধ পেতো, কিন্তু বলার উপায় ছিল না। বুড়োর সন্দেহ হতো, একদিন দরমার ফাঁক দিয়ে দেখেও ফেললো। বুড়োর যেমন হলো রাগ তেমন হলো দুঃখ। ভাবলো, বুড়িটা কি দারুণ নিষ্ঠুর! আমায় কচুর ঘ্যাঁট খাইয়ে নিজে খায় মাছের ঝাল! কিন্তু কি আর বলবে, বলে ফেললে আর উপায় নেই। তাই বুড়ো বাড়িতে না বলে বন্ধুদের কাছে বলতো মনের দুঃখের কথা। পাড়ার কারোরও বলার উপায় ছিল না, বললে আর রক্ষে নেই। এমনি দুঃখেই দিন কাটছিল। একদিন বুড়ো রাগের জ্বালায় বললো, বুড়ি, আমি কাশী চলে যাব, সেখানে ভিক্ষে করে খাব তবু তোর এখানে থাকবো না।

বুড়ি একগাল হেসে বললো, ভালোই তো, তুই গেলে কচু ঘেঁচুগুলো বেচে পয়সা জমাবো। আর কাশীতে মলে পুণ্য হবে, যা না চলে।

বুড়োর আরো দুঃখ হলো, কাশী যাবার পয়সাই বা কোথায়?

কিন্তু পয়সা একদিন জুটে গেল বুড়োর। বুড়ি একদিন সকাল বেলা চলে গেল বাপের বাড়ি। বাপের বাড়ি বলতে বাপ মা ভাই কেউই নেই, ছিল একটা ভাইপো আর তার বৌ। জমি জায়গা ছিল বেশ কিছু। আম কাঁঠালের বাগান ছিল বেশ বড়। গরমের সময় বুড়ির নিমন্ত্রণ থাকতো আম কাঁঠাল খাবার। তা বুড়োটাকেও সঙ্গে নে, তা নিতো না, তবে একটা রাতও কাটাতো না বুড়ি কোথাও গিয়ে।

সব সময় ঘর আগলে বসে থাকতো। ভাইপোর বাড়ি ছিল নদীর ওপারে। নৌকো করে যেতে হতো, বুড়ো আর বুড়িকে মাঝিগুলো চিনতো, বুড়ির স্বভাবখানাও জানতো, বুড়ি নৌকো-ভাড়া দিতে চাইতো না, ওপারে গিয়ে আর ফিরে তাকাতো না। পরে মাঝিরা পয়সা না

নিয়ে নদী পার করতো না। বাধ্য হয়ে বুড়িকে পয়সা দিতে হতো। বুড়ি চলে গেল বুড়োর জন্য দুটো ভাত আর কুমড়ো সেদ্ধ রেখে দিয়ে। বলে গেল আমি সন্ধ্যের আগেই ফিরবো, গরু ছাগলগুলোকে খেতে দিস বুড়ো।

দুপুরবেলা বুড়ো স্নান করে গরুকে খড়ের কুচি খেতে দিল। ছাগলকে দিল ঘাস খেতে, তারপর বুড়ো নিজে খেতে বসলো। ইস, ঘরে এতটুকু তেল রাখেনি বুড়ি যে কুমড়ো-ভাতে মেখে খাবে। বুড়োর দুঃখ ভগবানও বুঝি বোঝেন না।

বাগানের থেকে দুটো লংকা ছিঁড়ে এনে বুড়ো খেতে বসলো। খেতে খেতে বুড়ো ঘরটার দিকে একটু স্বাধীনভাবে দেখলো। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে দেখতে পেল, খাটের নীচে এক পাশে মাটিটা যেন একটু উঁচু। বুড়োর কেমন সন্দেহ 'হলো, তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে হাত ধুয়ে একটা শাবল এনে মাটিটা একটু খুঁড়তেই ঢপ্ করে একটা শব্দ হলো। বুড়োর মুখটা হাসিতে ভরে গেল। এইবার, কিপ্টে বুড়ির যখের ধন পেয়েছি। খুব আনন্দে খুঁড়ে ফেললো বুড়ো ঐ জায়গাটা। এই তো— এই তো একটা বাক্স, বুড়ো বাক্সটা টেনে বার করে যা দেখলো তাতে চোখদুটো আমড়ার আঁটির মত বড় বড় হয়ে গেল। বাক্সটা বোঝাই টাকা পয়সা, আর কিছু সোনা রূপো। ইস, আমাকে না খেতে দিয়ে দিয়ে পেটে চড়া পড়িয়ে দিয়ে এত টাকা পয়সা জমিয়েছে সারা জীবন ধরে! দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা বুড়ির। এই না বলে বাক্সটার থেকে বেশ কিছু টাকা পয়সা আর কিছু সোনা নিয়ে একটা পুঁটলি বাঁধলো। তারপর বাক্সটা যেমন ছিল তেমনি করে বসিয়ে কাদা মাটি লেপে দিল সেই জায়গাটায়।

আর দেরী না, এখনি যেতে হবে, বুড়িটা এসে পড়বে তা না হলে। ছেঁড়া জামাটা গায়ে দিয়ে পুঁটলি বগলে চললো বুড়ো ওপারে। তারপর বোনের বাড়ি এক রাত থেকে তারপর চলে যাবে কাশী। বুড়োর ছিল এক প্রাণের বন্ধু, নাম ছিলো দীনে ঠাকুর। বুড়ো শুধু কাশী যাবার কথাটা

বলে গেল, আর কিছুই বললো না। দীনে ঠাকুর বললো, আবার ফিরে এসো মাস দু-এক পরে। বুড়ো জানে, কথাটা গ্রামে রটে যাবে দীনে ঠাকুরের মুখ থেকে। বুড়ো মহা আনন্দে একটা নৌকো নিল। রহমত আলি মাঝি বললো, বেলা পড়ে এলো দা-ঠাকুর, চলেছ কোথায় ? এই যাচ্ছি বোনের বাড়ি। বোনের বাড়ি, কাশীর কথা আর বললো না। নৌকো কিছুদূর গিয়ে মাঝ-নদীতে পড়তেই বুড়ো দেখলো, বুড়ি আসছে। কাছে আসতে বুড়িও ট্যারা চোখে চিনতে পেরে বলে উঠলো, এ্যাই বুড়ো, চলেছিস কোথায় ? বুড়ো বললো, কাশী। বুড়ি খুশি হলো, তবে ভয় একটু হলো, অতগুলো টাকা পয়সা আর সোনা দানা নিয়ে রাত কাটাবে কি করে ? যা হোক বটার মা-টা খুব সাহসী, ওকে এনে দাওয়ায় রাখলেই চলবে। বুড়ি জানে, কাশী যাবে না ছাই, পয়সা পাবে কোথায় ? গেছে বোনের বাড়ি। দুদিন পরেই এসে উঠবে। বুড়ি ঘাটে পা ধুয়ে ঘরে ঢুকলো। বেলা তখনো আছে। বুড়ি পুঁটলিতে ছিল দুটো পাকা আম। ভাইপো-বৌ বেঁধে দিয়েছিল। বুড়ি টিন থেকে মুড়ি নিয়ে আম দিয়ে খেতে বসে গেল। হঠাৎ চোখে পড়লো খেতে খেতে, আরে, ওখানে কেন কাঁচা কাদা মাটি লেপা ! বুড়ির বুকটা ধড়াস করে উঠলো, সর্বনাশ, কে খুললো ? কে নিলো ? বাক্সটা খুলতেই বুড়ির প্রাণটা উড়ে গেল।

বুড়ি দেখলো, যা রাখা ছিল, তার সামান্য কিছু ফেলে রেখে সব নিয়ে গেছে। নিয়েছে আর কেউ না ঐ বুড়োটাই। চেঁচামেচি শুরু করল, কপাল চাপড়ে কাঁদতে লাগলো। গ্রামের লোক জড়ো হলো, কি হয়েছে বুড়ি, কি হয়েছে ? বুড়ি কাঁদতে কাঁদতে বললো, আমার সর্বনাশ হয়েছে, বুড়োটা আমার সব টাকা পয়সা গয়না-গাটি নিয়ে পালিয়েছে কাশী। আমি কোন কাল থেকে ঐ টাকা পয়সা জমিয়েছি, আমার একটা পয়সা কেউ নিতে পারেনি, কেউ চাইলেও একটা পয়সা কাউকে মুড়ি খেতে দিইনি গো ! আজ বুড়ো শয়তানটা আমার সব নিয়ে গেল। সব শুনে লোকের বললো, তা বেশ হয়েছে, যার জিনিস সে-ই নিয়ে গেছে। বলে হাসতে হাসতে যে যার ঘরে চলে গেল। বুড়ি চোখের জল মুছে ঘরে চাবি

দিয়ে যে কটা টাকা পয়সা ছিল পুঁটলি বেঁধে নিয়ে হন-হনিয়ে চললো গ্রামের পথ ধরে। ছেলে মেয়েরা দেখতে পেয়ে যে যার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললো, ও বুড়ি, যাচ্ছ কোথায় এই সাঁঝ বেলায়? বুড়ি বললো, যাচ্ছি কোথায় জানিস না? থানা পুলিস করতে। ছেলে মেয়েরা হো হো করে হাসতে লাগলো।

গাপ্পু আর পাপ্পু

আকাশে মেঘ জমেছে। ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। পাপ্পুটা মায়ের পাশে শুয়ে এ-পাশ ও-পাশ করছিল দুপুরবেলায়। গাপ্পুরও ঐ একই অবস্থা। ঠাণ্ডা দুপুরে মায়েরা তো বেশ নাক ডাকাচ্ছে, তাই বলে কি ওদেরও নাক ডাকবে না কি ? না, আর শুয়ে থাকা যায় না। গাপ্পু উঠে গিয়ে পাপ্পুর পায়ে সুড়সুড়ি দিল। পাপ্পু উঠে পড়লো। গাপ্পু পাপ্পুর কানের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে ফিসফিসিয়ে বললো, এ্যাই, খলসেপুরের মাঠে মেলা বসেছে, যাবি ? পাপ্পু গাপ্পুর দিকে একবার টেরিয়ে দেখে নিল। তারপর বললো, না বাবা একা একা যাব না। কি বোকা রে, একা আবার কি রে ? আমি তো যাবো। তোকে কেউ কিছু করলে এক ঘুঁসিতে উল্টে ফেলে দেব না! জানিস না, আমি রোজ ভোরবেলা আদা ছোলা খাই! পাপ্পু ভাবলো, সত্যিই তো, এমন একটা পালোয়ান দাদা থাকতে আবার পাপ্পুর ভয়টা কিসের ?

দুজনে মিলে খিড়কি খুলে চললো মেলা দেখতে, কাদা প্যাচপ্যাচে রাস্তা দিয়ে। কত দূরে রে দাদা, পাপ্পু জিজ্ঞাসা করলো। বেশী দূর না রে, ঐ যে ফটকে আছে, ঐ তাদের বাড়ির সামনের মাঠটায় মেলা বসেছে। তোমায় কে বললো গো দাদা ? পাপ্পুর প্রশ্ন। তুই একটা হাঁদারাম চণ্ডি, আমাদের বাড়ির রাখুর মা বললো না ? মা বললো, কি রে একদিন ছুটি করলি কেন ? কাল এলি না কেন ? ও বললো না, খলসেপুরের মেলায় গেসলুম ? তুইও তো সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলি। খলসেপুরে তো ফটকেদের বাড়িটা। ওখানে গেলেই চিনে নেব আমি। একা একা গেলে মা বকবে না ? আবার একা একা বলছিস ? আমি সঙ্গে আছি না ? তুই একা একা গেলে বকা খেতিস। কিছু দূর গিয়ে মনে পড়লো গাপ্পুর এ্যাই যাঃ, পয়সা এনেছিস ? পয়সা ?···হ্যাঁ, পয়সা। গাপ্পু তার সুন্দর

মুখখানাকে একটু বেঁকিয়ে বললো, জানো না, মেলায় গেলে পাঁপর ভাজা আর বেগুনি খেতে হয়? দাঁড়া, দেখি।—বলে গাপ্পু চিপু প্যান্টের পকেটে হাত গলিয়ে বললো, পেয়েছি। কাল দাদু আমায় লজেন্স খেতে চার আনা পয়সা দিয়েছিল, খেতে ভুলে গেছি। ভালোই হলো, প্যাঁজ ফুলুরি খাওয়া যাবে। চল্ চল্, মাথায় বৃষ্টি লাগছে। ঐ ছাখ পাপ্পু—ঐ বটগাছের তলায় বাঁদর খেলা হচ্ছে। চল্ চল্, ছুটে চল্।

কি বল্ পাপ্পু, আজ পাঁপর ভাজা খাওয়া যাবে। পেট কামড়াবে না? পেট কামড়াবে না। এমন হাঁদারাম তুই, পেট কামড়ানোটা কি কেউ দেখতে পাবে? তুই উপুড় হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাকবি। দেখবি কমে যাবে।

চল্, তাড়াতাড়ি পা চালা; সন্ধ্যের আগেই ফিরতে হবে। বেশ কিছু দূর যেতেই নজরে পড়লো, একটা বটগাছের তলায় বাঁদর খেলা হচ্ছে। চল্ চল্ পাপ্পু। গাপ্পু পাপ্পুর হাত ধরে টানতে টানতে ছুটতে লাগলো। বাঃ, ডুগ ডুগ ডুগ বেশ বাজনা বাজছে! কত ভিড় জমেছে! কি মজা, ঐ দেখ বাঁদরটা কেমন নাচছে! ওরা দুজনে গিয়ে দাঁড়ালো বাঁদর নাচের কাছে। দুটো বাঁদর নাচছে, আর একটা বাঁদর বসে বসে কলা খাচ্ছে। গাপ্পু আর পাপ্পু বেশ জমে গেছে। নাচ হতে হতে এক সময় নাচ থামলো। বাঁদর নাচানোর লোকটা বললো—এবার যাও নীল-কুমারী ফুলকুমারী বাবুদের সেলাম জানাও। আস্তে ভিড় ফিকে হতে শুরু করলো। গপ্পু পাপ্পু দেখতে যখন এসেছে শেষটা দেখে শুনে যাবার ইচ্ছেটা। তাই দাঁড়িয়েছিল চুপচাপ।

ঘুরতে ঘুরতে নীলকুমারী ফুলকুমারী এসে গাপ্পু আর পাপ্পুর পায়ে যেমন হাত দেওয়া, ওরে বাবা রে—বলে গাপ্পু দে দৌড় পাপ্পুর একটা হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে। দুজনেই বেদম ছুটছে, ভাবছে, নীল-কুমারী আর ফুলকুমারী বোধহয় পিছনে তাড়া করেছে সেলাম করতে। একটা জায়গায় বেশ কাদা জমে ছিল—পিছল পিছল, দৌড়তে গিয়ে গাপ্পু পড়লো ধড়াম করে। তার পেটের উপর পড়ে গেল পাপ্পু। কাদা

মাটি সারা গায়ে মেখে গাপ্পু আর পাপ্পু উঠে দাঁড়াতে গাপ্পু বললো, এ্যাই, তুই এত ভীতু কেন রে? ঐ রকম করে দৌড়ে এলি কেন রে? একটা বাঁদর দেখে এত ভয় কেন রে? একেবারে আমাকে ধাক্কা-মাক্কা দিয়ে পালাচ্ছিস! দেখ তো সারা গায়ে মুখে কি রকম কাদা মেখে গেল! ভীতুর ডিম! পাপ্পু হাত দিয়ে মুখের কাদা মুছতে মুছতে বললো, বা রে, আমি আগে ছুটেছি নাকি? তুমিই তো আগে ছুট লাগালে, দাদা হয়ে ভয় পেলে, আর আমি ছোট ভাই হয়ে ভয় পাব না বুঝি? দেখ, আমার বুকটা কেমন ঢিপিস ঢিপিস করছে! গাপ্পু বলল কাঁদো কাঁদো সুরে। পাপ্পু বেশ জোরে চেঁচিয়ে বলে উঠলো, বারে আমারও বুঝি আর করছে না? আমারও তো মাথায় লেগেছে, হাতে লেগেছে। বাড়ি গেলে যা বকবে না!

ইস, তোকে মেলা দেখানো হলো না। চল্ চল্ শীগগিরি চল্। এ্যাই শোন পাপ্পু, আমি এত ছুটেছিলাম কেন জানিস? আমি ভাবলাম, তোকে ছোট পেয়ে বাঁদর দুটো বোধহয় কামড়ে খিমছে নেবে। তাই তোকে নিয়ে ছুট লাগালাম। তোমায় একবার যদি ধরে ফেলতো, ব্যাস ওরা দুজনে টানতে টানতে ওদের বাড়িতে নিয়ে যেত। আহা, আমায় ধরতো, আর তোমায় বুঝি ধরতো না? পাপ্পু গাপ্পুর কথার উত্তর দিল। ইস, আমায় ধরতে এলে এক ঘুষিতে উল্টে ফেলে দিতাম না? আমি রোজ আদা ছোলা খাই না? তুই তো আমায় ফেলে দিয়ে ধপাস করে আমার পেটের উপর পড়ে গেলি। আমার কি লেগেছে? আমার কি পেট ব্যাথা করছে?

না স্যার—আমার আগেই তুমি পড়ে গেছ। তা না হলে তোমার পেটের উপর পড়বো কি করে? গাপ্পু আর কি বলবে, চুপ করেই রইল। একটু থেমে থেকে বললো, এ্যাই, খলসেপুরের মেলা আর কত দিন থাকবে, রামুর মাকে জিজ্ঞাসা করবো কি বল পাপ্পু। পাপ্পু বললো, না বাবা আমি আর আসছি না তোমার সঙ্গে, আবার পড়ে যাব। গাপ্পু বললো, আরে রোজই কি নীলকুমারী আর ফুলকুমারী তাড়া করবে

না কি বোকা! এ্যাই, চুপ—দাদু আমাদের খুঁজতে বেরিয়েছে নিশ্চয়ই।...এ্যাই—দুটোতে মিলে কোথায় যাওয়া হয়েছিল ?...এই রে—দাদুটা এক্কেবারে সামনে পড়েছে, গাপ্পু বললো ভয়ে ভয়ে। এ কি রে, সারা গায়ে কাদা মাখলি কি করে, ছিঃ ছিঃ! চলো বাড়িতে, আজ হবে এক চোট। দাদু হাসতে হাসতে বললো, এ্যাই দস্যিরা, কোথায় যাওয়া হয়েছিল। দুপুর বেলা একা একা ? গাপ্পুর মা বললো, এ মা—ছিঃ ছিঃ, কি কাদা মেখে ভূত হয়ে এসেছে! দাঁড়াও—তোমাদের মজা দেখাচ্ছি। দাদু বললো, না না—থাক, আর মজা দেখাতে হবে না। এখন জামা-টামা ছাড়িয়ে দাও। কোথায় গেছিলি রে; বড্ড সাহস বেড়েছে দেখছি—পাপ্পুর মা খুব রেগে গিয়ে বললো। মিথ্যে কথা বললো না কেউ। ওরা বললো, বাঁদর নাচ দেখতে। বাঁদর দুটো তাড়া করেছিল, তাই কাদায় পড়ে গেছি। একটা চাঁটি মেরে বললো, আর যাবি ? একা একা সাহস দেখাতে যাওয়া হয়েছিল ? দুজনে খেতে বসে দেখতে লাগলো পায়ে নীলকুমারীর আঁচড় লেগেছে নাকি। না, বাগে পায়নি, বাগে পেলে পায়ের মাংস তুলে নিত। আর যাচ্ছি না বাবা খলসে-পুরের মেলা-টেলা দেখতে, পাপ্পু হালুয়া খেতে খেতে বললো। গাপ্পু বললো—তুমি একটা ভীতু চণ্ডি।

অদ্ভুত কুকুর জিন

অস্ট্রিয়ার একটি রূপসী গ্রাম ইনস্‌ব্রুক। বেশির ভাগ সময়ই গ্রামটি বরফে ঢাকা থাকে। পৃথিবী-বিখ্যাত আলপস পর্বতে ঘেরা অস্ট্রিয়া আমি নিজের চোখে দেখে এলেও সমস্ত রকম সৌন্দর্য বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। অস্ট্রিয়ার মধ্যে একটি সুন্দর গ্রাম ইনস্‌ব্রুক, আমরা ইনস্‌ব্রুকে গিয়েছিলাম এক অস্ট্রিয়ান উৎসব দেখতে। আলপস পর্বতের চব্বিশ হাজার ফিট উঁচুতে এক সুন্দর হোটেলে আমরা ছিলাম। ইনস্‌ব্রুক গ্রামটিও আমার কাছে খুব সুন্দর লেগেছে। সারা ইওরোপের ছেলে-মেয়েরা যেমন সুন্দর, তাদের ঘর বাড়িও সুন্দর। ইওরোপের পনেরো বছরে ছেলেমেয়ে থেকে শুরু করে বুড়ো বুড়িরা পর্যন্ত কাজ করে। তারা রিটায়ার্ড হয়ে গেলে সব্বাই পেনসন পায়, তবে অনেকেই ছোট ছোট কাজও করে, পেনসনও পায়। তবে ও দেশের বুড়ো বুড়িরা খুবই অসহায় হয়ে পড়ে, তাদের দেখার কেউই থাকে না। ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেলে যে যার আলাদা হয়ে যায়। মা বাবাকে দেখে না বেশির ভাগ ছেলেমেয়েরাই। বুড়ো বুড়িদের দিন কাটে কুকুর বেড়াল নিয়েই। ওদেশে কুকুর বেড়ালের এত যত্ন, না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না। ওরা ঠিক ঘরের ছেলেমেয়েদের মত। সেই একটা অদ্ভুত কুকুরের গল্প তোমাদের শোনাচ্ছি।

ইনস্‌ব্রুক গ্রামে মিসেস হারবার্ট নামে এক ভদ্রমহিলা বাস করতেন। ভদ্রমহিলার পরিবার বলতে স্বামী আর দুটি ছেলে চার্ল ও মার্ক, আর একটা কুকুরের ছানা জিন্। খুবই সুখের সংসার ছিল মিসেস হারবার্টের। কোনো দুঃখই ছিল না তাঁর মনে। ছেলে দুটিও অন্য ছেলেদের থেকে ভালো ছিল। মিসেস হারবার্ট আনন্দেই ছিলেন। কিন্তু একসময় হারবার্টের সংসারে শোকের ছায়া নামলো। হার্টের রোগে হঠাৎ তাঁর

স্বামী মারা গেলেন, বড় ছেলেটি গাড়ি-দুর্ঘটনায় মারা পড়লো ; ছোট ছেলে মার্ক সাঁতার কাটতে গিয়ে মারা গেলো। পর পর এতগুলো শোকে একেবারে ভেঙে পড়লেন, আর প্রতিবেশীরা হলেন আহত। উইলো ও আপেলে ছাওয়া ইনস্‌ব্রুকের ছোট্ট পাড়াটায় শোকের ছায়া নামলো। গ্রামে আছে চার্চ। চার্চের সামনে সমাধিক্ষেত্রে উইলো গাছের ছায়ায় মিসেস হারবার্টের স্বামী আর দুটি মোমের পুতুলের মত ছেলেকে সমাধিস্থ করা হলো। মিসেস হারবার্ট ছিলেন ধার্মিক মহিলা। প্রতিদিন নিয়মিত তিনি চার্চে গিয়ে প্রার্থনা করতেন। কিন্তু পর পর এতগুলো শোক পেয়ে ভেঙে পড়লেন। তবুও তিনি একরাশ চোখের জল নিয়ে সমাধিক্ষেত্রে প্রিয়জনদের সমাধিতে ফুল দিয়ে আসতেন রোজ সন্ধ্যেবেলা। সঙ্গে থাকতো জিন—সেই অদ্ভুত কুকুরটি। জিন সব সময় মিসেস হারবার্টের পায়ে পায়ে ঘুরতো। মিসেস হারবার্ট রান্নাবান্নাও ছেড়ে দিলেন। কাদের জন্য রাঁধবেন তিনি? কারা খাবে খুশি হয়ে টেবিল ঘিরে বসে? জিনকে খাওয়াতেন টিন ফুড, নিজে সামান্য কিছু খেয়ে ভালো ভালো বই নিয়ে পড়ে থাকতেন অথবা চার্চে গিয়ে সময় কাটাতেন ; সঙ্গে থাকতো জিন। প্রতিবেশীরা আসতো, কিন্তু মিসেস হারবার্টের কারুকেই ভালো লাগতো না এক জিনকে ছাড়া। জিনকে খুবই যত্ন করতেন। জিনও সব সময় মিসেস হারবার্টকে আনন্দে রাখতে চাইতো। সব কিছু বুঝতে পারতো জিন। সে নিজের ছেলের মত করতো। যত দিন যেতে লাগলো, ততই জিন যেন মানুষের মত ব্যবহার করতে শুরু করলো। হারবার্ট দেখে দেখে খুব অবাক হতে লাগলেন। ক্রমশ জিনের দিকে আকৃষ্ট হতে লাগলেন। একটু একটু করে ঘর সংসারের কাজ শুরু করলেন। রান্নাবান্নাও একটু আধটু করতে শুরু করলেন। জিনকে নিয়ে খেতে বসতেন। বাজার-হাটও করতে শুরু করলেন।

একদিন আলমারী খুলে দেখেন হারবার্ট জিনের জন্যে একটুও খাবার নেই। চললেন রুটি মাংস আনতে। এসে দেখলেন, জিন মরে পড়ে

আছে। খুব কাঁদলেন মিসেস্ হারবার্ট। তারপর চললেন কফিন আনতে। এসে দেখেন, জিন মানুষের মত হাসছে। মিসেস হারবার্ট অবাক হলেন খুবই। কফিনটাকে ফেরত দিয়ে এলেন। এসে দেখেন, জিন চুরুট মুখে দিয়ে বসে আছে। হেসে খুন হলেন মিসেস হারবার্ট। জিন এতদিনে মিসেস হারবার্টের মুখে হাসি ফোটালো। জিনকে খেতে দিয়ে মিসেস হারবার্ট গেলেন রুটি আনতে। এসে দেখেন, খাওয়া শেষ করে জিন ডিসটাকে খুব চাটছে। হারবার্ট খুব হাসতে লাগলেন, তারপর গেলেন মাছ আনতে। এসে দেখেন, জিন হারবার্টের স্বামীর বাঁশের বাঁশী নিয়ে বাজাচ্ছে আর নাচছে। দেখে মিসেস হারবার্ট আনন্দে কেঁদেই ফেললেন। মনে মনে ঈশ্বরকে বললেন, হে ঈশ্বর, আমার চার্লি আর মার্কের দুঃখ ভোলবার জন্যেই কি কুকুরবেশী একটা ছেলেকে পাঠালে! বার বার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগলেন। মিসেস হারবার্ট জিনকে ঘরে রেখে গেলেন রান্না করতে, ভাবলেন জিনই আমার চার্লি আর মার্ক। ওর জন্যে রাঁধতে হবে। রাঁধতে রাঁধতে জিনের ঘরে ঢুকে দেখেন, জিন ঠিক মানুষের মত বসে আছে চেয়ারে পা ঝুলিয়ে। দেখে হাসতে হাসতে বললেন, জিন, তুমি কে বল তো? আমি তোমায় চিনতে পারছি না। জিন কোনো সাড়া দিল না। শুধু মিসেস হারবার্টের দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে লেজ নাড়াতে লাগলো। একদিন মিসেস হারবার্ট গেলেন দোকানে, বলে গেলেন, জিন, তুমি ঘরে থাক, আমি আসছি। মিসেস হারবার্ট গেলেন বাজার করতে। এসে যা দেখলেন, তাতে তিনি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। পাশের বাড়ির বেড়াল ব্ল্যাকীকে জিন দুধ খাওয়াচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে উনি ধপাস করে বসে পড়লেন চেয়ারে, একি কাণ্ড! বেড়ালটা আরাম করে দুধটা খেয়ে জিনের কাছে বসে রইল। একটু পরে ব্ল্যাকীকে খুঁজতে এলেন মিসেস স্মিথ। এসে দেখেন, ব্ল্যাকী বসে আছে জিনের কাছে। মিসেস হারবার্ট জিনের সমস্ত কথা বললেন স্মিথের কাছে। তারপর থেকে ঘন ঘন লোক আসতে লাগলো মিসেস হারবার্টের বাড়িতে কুকুররূপী জিনকে দেখতে, এমন কি

চার্চের পাদ্রী পর্যন্ত। উনি বললেন, ঈশ্বরের লীলা। শোকে সন্তপ্ত মেয়েকে সান্ত্বনা দিতেই আগে থেকেই ঈশ্বর ওকে পাঠিয়েছেন। জিনকে দেখে সবাই খুশি, আর মিসেস হারবার্ট শোক ভুলে জিনের নেশায় মত্ত হলেন। মিসেস হারবার্টের জীবনে মস্ত সঙ্গী হলো জিন। জিন সব সময় মিসেস হারবার্টের সুখ-সুবিধা দেখত, অসুখ হলে মাথার কাছে বসে থাকত। মিসেস হারবার্ট সব দুঃখ ভুলেছিলেন জিনকে নিয়ে।

বন পাহাড়ের চিঠি

মিমি,

এখন ভোর ছটা, আমি তোমায় চিঠিটা লিখছি ম্যাকলাস্কীগঞ্জে মিসেস কানির বন পাহাড়ে ঘেরা সুন্দর গেস্ট হাউসে বসে। এখন এখানে ভীষণ শীত পড়েছে, চারধারে কুয়াশায় ঢাকা। আমাদের সামনে পাহাড়টার গা বেয়ে সিঁদুরের লাল গোল্লার মত সূর্যটা খুব আস্তে আস্তে উঠছে কুয়াশার পর্দা সরিয়ে। পাহাড় আর পাহাড়ের নীচের গ্রামগুলোর ঘুম ভেঙেছে অনেকক্ষণ। মেয়ে পুরুষ যে যার কাজে বেরিয়ে গেছে ভোর না হতেই। একদল সাঁওতাল মেয়ে চলেছে গেস্ট হাউসের পাশের শালবনের পথ ধরে, কয়লাকুঠিতে কয়লা তুলতে।

ওরা চলেছে গান গাইতে গাইতে, ওদের গান পাহাড় আর শাল পিয়ালের সুরে বাঁধা। ওরা গায়—

"আম পাতা জাম পাতা
চিহরলতা না,
আরে কেনেরে বোন
কেনে বোনে ফুলা লিবিরে—"

সে গান সভ্য জগতের মানুষ বোঝে না, তাই তুমিও বুঝবে না। আমার কিন্তু খুব ভাল লাগে। কেমন যেন শিরশিরিনী জাগায় সকাল সন্ধ্যে। ওরা আবার ফিরবে সন্ধ্যে হতেই। ওদের কালো পায়ের মল বাজছে ঝুমঝুম। ওরা সব সময় হাসে। কত দুঃখে থাকে ওরা তবু ওদের মুখ ভরা হাসি আর বুক ভরা খুশি। গুজরী আর ঝলোয়া নামে দুটো মেয়ের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেছে। ওরা কথায় কথায় হেসে গড়িয়ে পড়ে। আমাদের সামনে বাগানের গাছে সবুজ হলুদ আর ফিকে নীল রং-এর তিনটে পাখী উড়ে এসে বসল। দেখে মনে হচ্ছে ওরা খুব

ক্লান্ত। হয়তো খু-উ-ব দূরের পাহাড়ের চূড় থেকে বা কোয়েল নদীর কোল থেকে উড়ে এসেছে। এখন ওরা ডানা মেলে জিরিয়ে নিচ্ছে। বড় দিদা আর বড় মামা বসে আছেন আমার পাশে ইজি-চেয়ারে। বড় মামা পাইপ টানছে মৌজ করে। নিশ্চয়ই একটা সুন্দর গল্পের প্লট তৈরী করছে পাইপ টানার ফাঁকে ফাঁকে। বড় দিদা শীতে জবুথবু। এখনই মিসেস কার্নির আয়া রাজিয়া বিবি বেগম বেগম চেহারা নিয়ে আমাদের সামনে ডবল ডিমের ওমলেট আর চা দিয়ে গেল। আমরা এবার ব্রেকফাস্ট সারবো। এদেশের লোকেরা খুব সরল আর সাহসী। পাহাড় বন থেকে মাঝে মাঝেই আসে হায়না, ভাল্লুক, ফেউ, এমন কি কখনও কখনও বাঘও। এদেশের মেয়ে পুরুষ আদিবাসীদের ভয় নেই। এখন শীত। মহুয়া গাছে মহুয়া ভরে গেছে। রাতের অন্ধকারে ভাল্লুক আসে মহুয়া খেতে। তুমি থাকলে ভয় পেতে নিশ্চয়ই। জানো, ম্যাক-লাক্সীগঞ্জটা পাহাড়ের রেঞ্জ দিয়ে ঘেরা। যেদিকে তাকাই পাহাড় আর পাহাড়। দেখে দেখে ক্লান্ত হয় না চোখ দুটো। এক ঝাঁক বনটিয়া আমাদের সামনে দিয়ে উড়ে গেল ট্যাঁ-ট্যাঁ করতে করতে।

আমরা কাল পালামৌ ন্যাশনাল পার্ক দেখতে গিয়েছিলাম। তুমি নিশ্চয়ই জান ওখানকার জন্তু জানোয়ারকে মারার হুকুম নেই। আমরা সেই সব জন্তু দেখতে গেলাম। সন্ধ্যে সাতটায় আমরা জীপে করে রওনা হলাম। বড় দিদা, বাবুয়া মামা, আরো তিনজন ছেলেমেয়ে আর আমি। যেমন ভীষণ শীত, তেমনি ভীষণ জঙ্গল। সেই গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হু হু করে জীপ চল্‌ছে তো চল্‌ছেই। জীপের মাথায় ছিল স্পট্ লাইট। স্পট্ লাইট ফেলে ফেলে শিকারী ড্রাইভার দেখাচ্ছিল জঙ্গলের জন্তু জানোয়ার। দেখলাম চোখে আলো পড়তে একদল স্পটেড্ হরিণ আর সম্বর দাঁড়িয়ে পড়ল বন্য পোজ নিয়ে, ভারি সুন্দর লাগলো। তারপরই একদল বাইসন, চোখে আলো পড়তেই ভীষণভাবে তাকালো আমাদের দিকে। ভাবলো জঙ্গল মহলের মানুষ, এত বড় সাহস? হয়ত ঝাঁপিয়ে পড়তো আমাদের উপর কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই এক্সপার্ট ড্রাইভার

জীপটাকে ফুলস্পীডে চালিয়ে দিল। জঙ্গল থেকে হাতির আওয়াজ শোনা গেল। দেখা হল না, শোনা গেল দু-তিন দিন আগেই নাকি জঙ্গল থেকে নেমে রেস্ট হাউসের সামনে দুটি সাহাবের গাড়িকে এক হাতি মশাই আছাড় মেরে বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছে। যত কুলিরা মশাল জ্বালিয়ে আর টিন বাজিয়ে হাতি মশাইকে জঙ্গলে তাড়িয়েছে। তাই তোমার দিদা হাতি দেখতে দিলেন না। বুনো হাতিকে বিশ্বাস কি? যদি আমাদের জীপটাকে তুলে আছাড় মেরে দেয়, তবেই তো ভবলীলা সাঙ্গ, তোমার কাছে গিয়ে গল্প বলা হোত না। কি বলো?

জীপে আমায় জড়িয়ে ধরে বসেছিলেন দিদা, যাতে না আমাকে হাতি মশাই শুঁড় দিয়ে টেনে নেয়।

মিমি, সূর্য্যটা এখন নীল আকাশের বুকে তিরতির করে উঠে পড়েছে। বন পাহাড় আলোয় আলো। আমাদের গায়ে এসে মিষ্টি রোদ পড়েছে। একটু বেড়াতে যাব। ঐ দূর পাহাড়টায়, যেখানে পাহাড়ী ঝাউগাছগুলো আকাশটাকে আষ্টে পিষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। তাই এখন চিঠির ঝাঁপি বন্ধ করলাম কেমন?

গিয়ে গল্প হবে।

—ছোট দিদা

'পেঁচো আর মেছোভূত'

নালতেপুর গ্রামের পেঁচোটাকে দেখতে পারে না কেউ। যেমনি ওর রূপ তেমনি ওর গুণ। আগে ওর রূপটাই বলি, রংটা কালো মিশমিশে, চোখ দুটো ঠিক আট্টিল গুলির মতো গোল গোল আর বড় বড়, নাকটা ঠিক কলাইডালের বড়ির মতো, ঠোঁট দুটো মোটা মোটা, আর চুলগুলো সজারুর কাঁটার মতো খাড়া খাড়া। দাঁতগুলো পোকা-খাওয়া। রূপখানা বুঝতেই পারছ কেমন। তার উপর আবার কান দুটো হাতির মতো কুলো কুলো। অন্ধকারে ওকে দেখলে একেবারে হার্টফেল্। আবার লেংচে চলে।

এবার বলি ওর গুণের কথা—যেমনি বলে মিথ্যে কথা তেমনি করে চুরি, তেমনি দেয় লোককে গালাগালি। সারাদিন ঘুরে ঘুরে দুষ্টুমি করে বেড়ায়। হয়তো কারো বাগানে ঢুকে ফল-পাকড় পেড়ে খেয়ে ডাল-পালা ভেঙে তছনছ করে দেবে, নয়তো কারো পুকুরের মাছগুলো চুরি করে নিয়ে পালাবে। শুধু কি দিনে দুপুরেই? রাত্তিরবেলাও ঘুরে ঘুরে ঐ সব দুষ্টুমি করবে। ভয় ডর বলে ওর বুকে কিচ্ছু নেই। একে গাছ-গাছালি ছাওয়া ঝোপঝাড়ে ভরা গ্রাম, তার উপর আবার রাতের অন্ধকার, বাইরে যেতে বড়রাই ভয় পায়, আর পেঁচোর নেই কোনো ভয় ডর। ভোরবেলা উঠে গৃহস্থরা চেঁচামেচি শুরু করে দেয়, এ বলে কাল সন্ধ্যে পর্যন্ত গাছে মোচা দুটো ছিল, আজ গেল কোথায়? ও বলে কুটুমবাড়ি পাঠাব বলে এক কাঁদি কলা রেখেছিলাম. গেল কোথায়? কেউ বলে, ছেলেপুলেকে খেতে না দিয়ে ডাঁশা ডাঁশা পেয়ারাগুলো রেখেছিলাম, একটা বলতে নেই গো? চেঁচামেচিতে পাড়া মাত হয়। কে নেয় তাও তারা জানে, তবু কি সত্যি কথা বলার সাহস কারো আছে? রাগে সব্বার গা জ্বলে যায়, ইচ্ছা হয় পেঁচোটাকে একদিন

সব্বাই মিলে মেরে হাতের সুখ মিটিয়ে নেয়। আর গায়ের জ্বালা ঝেড়ে দেয়। কিন্তু পেঁচোটা তো রাম শয়তান, তারপর ওর যা একখানা পিসি আছে তার কথা বলার নয়। দেখতে ঠিক ডাইনি বুড়ির মতো, মায়া দয়া বলে জিনিসটা তার মধ্যে মোটেই নেই। পেঁচোটা তো ওরই মতলবে চলে। পিসিটা গিয়ে এ-বাড়ি ও-বাড়ি বাগান দেখে এসে পেঁচোকে চুরি করার যুক্তি দেয়। পিসির জন্য পেঁচোকে কারো কিছু বলার সাহস থাকে না। পেঁচোর নামে কিছু বললে আর উপায় নেই, ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে আসবে।

তাছাড়া বুড়িটাকে সব্বাই ভয় করতো বেশি, তার কারণ বুড়ি নাকি তুক্‌তাক্ জানত, মন্ত্র পড়ে নাকি মানুষের নানা ক্ষতি করতো। একদিন কুমোরপাড়ার মাণিক পালের গোয়ালে ঢুকে দুধেল গরুটার সবটুকু দুধ দুইয়ে সট্‌কে পড়ছিল, মাণিক পালের ছেলে পল্টা দেখতে পেয়ে খুব চেঁচামেচি শুরু করল। সবাই ছুটলো সজনেতলায় পেঁচোর বাড়ি। ওদের চেঁচামেচিতে সারা গাঁর লোক জড়ো হয়ে গেল, পেঁচোকে দু-এক ঘা দিয়েও দিল কেউ কেউ। এই না দেখে পেঁচোর পিসি একটা মস্ত বড় বঁটি নিয়ে এমন বোঁ বোঁ করে ঘুরোতে লাগলো সেই দেখে সব্বাই চোঁ-চাঁ দৌড়।

কিন্তু বঁটি ঘুরিয়েই থামলো না বুড়ি, সেই দিনই রাতের অন্ধকারে গিয়ে মাণিক পালের সুন্দর দুধেল গরুটাকে তুক্‌তাক্ করে দুধ বন্ধ করে দিয়ে এলো। কী সর্বনাশ! মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে বসলো মাণিক পালের বৌ সকালবেলায়। বুকটা ফেটে যেতে চাইল দুঃখে। কিন্তু কে বুঝবে তাদের দুঃখ! তাই ভগবানের কাছে নালিশ জানায়, বলে, হে ভগবান, হয় পেঁচো আর তার পিসির স্বভাব ভালো করে দাও, না হয় গ্রাম-ছাড়া কর। পেঁচোকে একটু ধমক দিলে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে পিসির কাছে সাতখানা করে লাগায়, আর পিসি এসে চুপি চুপি মন্ত্র-টন্ত্র ঝেড়ে মানুষের ক্ষতি করে। গ্রামের সব্বাই অস্থির ওদের জন্য। পিসির আদরে পেঁচোটা গোল্লায় গেছে। মিথ্যা কথা বলে, চুরি করে।

লেখাপড়া তো করেই না, পাঠশালায় যাবার নাম করে পিসির কাছ থেকে পয়সা নিয়ে রাস্তায় কিছু কিনে খেয়ে নিত, আর ছেলেরা যখন পাঠশালা থেকে ঘরে ফিরত পেঁচোটাও সেই সময় ঘরে ঢুকতো। পিসি ভাবত ছেলে বুঝি কত না কি পড়ে ঘরে এলো। পেঁচো আর তার পিসি থাকতো গাঁয়ের শেষে সজনেতলায়, ওধারে দু-এক ঘর ছাড়া আর কেউই থাকত না। ওখানে খুব সজনে গাছ আছে বলে জায়গাটাকে বলে সজনেতলা। পেঁচোর আপন বলতে আছে শুধু ঐ শাঁকচুন্নি পিসিটা আর মাটির ঘরটুকু। পেঁচো জন্মাবার এক বছরের মধ্যেই নাকি ওর মা বাবা দুজনেই মরে গেছে। গাঁয়ের লোক তাই তো বলে। পেঁচোর বয়সটাও কেউ ঠিকঠাক বলতে পারে না, দাড়ি গোঁফ গজায়নি, সুতরাং পেঁচোর পিসির কাছে ও নাকি দুধের শিশু। গাঁয়ের লোক বলে ওর বেশ বয়স, ও নাকি বেঁটে বামন। এ কথা অবশ্য ওরা বলে নিজেদের মধ্যেই, প্রকাশ্যে বলার সাহস গাঁয়ের মানুষের কারো নেই। শাঁকচুন্নি পিসিটা একবার শুনলে হয়। তবে আর রক্ষে থাকবে না কারো। ওদের ভূত পেত্নী যা বল সব ঘরে ঘরে, যেন না শুনতে পায় ঐ দুটো। যেমনি পেত্নীর মতো দেখতে পিসিটা, তেমনি ভূতের মতো দেখতে পেঁচোটা। সব্বাই বলে শাঁকচুন্নি-পিসির মামদো ভাইপো। পেঁচোটা নিজের পাড়ায় থাকে না, সারাদিন নিতুদের পাড়ায় ঘোরে।

নিতু লেবু মেধো শিবে আর গাপ্পু এরা সবাই ভালো ছেলে, থাকে একই পাড়ায় পাশাপাশি, এদের মা-বাবারাও খুব ভালো। গাপ্পুর নাম গোপাল, আদর করে সবাই ডাকে গাপ্পু। ভারি শান্ত আর লক্ষ্মী ছেলে, সবাই ভালোবাসে। ও পাড়ার ছেলেদের মধ্যে গাপ্পুই ছোট। নিতু লেবু মেধো শিবে গাপ্পুকে যত্ন করে পাঠশালায় নিয়ে যায়, আবার নিয়ে আসে। দেখতেও সুন্দর, হাব্‌লা-গোবলা, শান্ত-শান্ত বেচারা-বেচারা ভাব। তাই সব্বাই ভালোবাসে। ওর উপরই নজর রাখে পেঁচোটা। একদিন নাকি পেঁচোর কাঁঠাল চুরির কথা গাপ্পু ওর বাবাকে বলে দিয়েছিল, আর রাগের চোটে পেঁচোর পিঠে গাপ্পুর বাবা খুব জোরসে একটা

কিল বসিয়ে দিয়ে কাঁঠালটা কেড়ে নিয়েছিল। সেই থেকে পেঁচোর রাগ ঐ গাপ্পুর ওপর। কিন্তু কিছুই করবার সুযোগ পায় না পেঁচো।

গাপ্পু একা পথে বেরোয় না। দলবল থাকে সঙ্গে। পাঠশালায় যায় নিতু, লেবু, মেধো আর শিবের সঙ্গে। তাই মওকায় পায় না পেঁচো গাপ্পুকে এক সময়ও। পেঁচোর পিসিটা হাড়কিপ্টে, নিজের কিছু জমি-জমা আছে, আর আছে মাছভরা পুকুর। ঐ পুকুরের মাছ সব বাজারে হাটে বিক্রি করবে, আর পরের পুকুরের মাছ চুরি করে খাবে। বলার কিছু নেই। পাড়ার ছেলেরা পেঁচোর সঙ্গে মেশে না, তাই বুড়ির রাগ। নিতু একদিন বলেছিল, তোমার পেঁচো আবার ছেলে নাকি, বুড়ো মামদো। আর যায় কোথায়, নিতুর গুষ্টিকে মামদো করে ছেড়েছিল বুড়ি। কথা শুনে কিন্তু পেঁচোটা রাগ করেনি, বোকার মতো পোকায় খাওয়া দাঁতগুলো বার করে খ্যা খ্যা করে হেসেছিল।

একদিন হলো এক ভারি মজার কাণ্ড। সেদিন উঠলো ভীষণ ঝড়, যাকে বলে কাল-বোশেখী। আকাশ কালো করে এলো ঝড়, চারধার অন্ধকার। তার উপর সন্ধ্যে হয় হয়। যে যেদিকে পারছে সে সেদিকে ছুটছে, বাড়ির দিকেই।

সবাই যে যার ছেলে সামলাচ্ছে, হাঁকডাক চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেছে, মাঠ পেরিয়ে এসে পেঁচোর পিসি ভীষণ চেঁচাচ্ছে, ওরে আমার পেঁচো রে, কোথায় গেলি রে সোনা, ও আমার চোখের মণি রে, ওরে আমার নন্দদুলাল রে!…চেঁচানি আর কান্না শুনে খ্যান্তর মা বলে উঠলো, আহা রে, কি তোমার নন্দদুলাল গো, তার জন্য আবার কান্না! হতচ্ছাড়াটা গ্রাম ছাড়া হোক, দূর হোক, আবার ন্যাকা কান্না হচ্ছে শাঁকচুন্নির! ভাগ্যি ভালো, শোকের মুখে খ্যান্তর মার কথাগুলো শোনেনি বুড়িটা। চেঁচাতে চেঁচাতে সোজাসুজি চলে এলো নিতুদের পাড়ায়। এই সুযোগে যার যা খুশি পেঁচোর শ্রাদ্ধ করে নিল আশ মিটিয়ে। তখন নেহাত কিছু বলার মতো অবস্থা নেই পেঁচোর পিসির তাই শুধু পেঁচো রে পেঁচো রে বলে ডুকরে কাঁদতে লাগলো। কেউ সমবেদনাও

জানালো না।

ঝড়টা কমলো সময়মত। যে যার বাগানে গিয়ে দেখতে লাগলো কার গাছের কি পড়লো। নিতুর বাবা একটা হ্যারিকেন জ্বালিয়ে নিয়ে দেখছিল আম জাম কিছু পড়লো কিনা, এমন সময় শুনতে পেল একটা গোঁ গোঁ শব্দ। নিতুর বাবা হাঁকডাকে লোক জড়ো করলো। পেঁচোর পিসিও পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো। নিতুর বাবার ডাকে এলো আরো গোটা পাঁচ-ছয়েক হ্যারিকেন লোকের হাতে হাতে। কে—কে শব্দ করছে ? কে—রে…কে—রে ? সবাই একবার করে চেঁচাচ্ছে। তখনও গাছগুলো বেশ দুলছিল, আওয়াজটা যেন মনে হচ্ছে আমগাছটার থেকেই আসছে। ওরে আওয়াজটা আমগাছের থেকেই আসছে, আর যাবে কোথায়, ওঠ ওঠ করে তিনচার জন ছেলে উঠে পড়লো আলো নিয়ে আমগাছে। ও বাবা—বাবা গো—মগডালে ঝুলে আছে পেঁচোভূতটা ! আনন্দে চিৎকার করে উঠলো নিতু। নিমু হাততালি দিয়ে বলতে লাগল, বেশ হয়েছে—বেশ হয়েছে। গাপ্পু মেধো শিবে সব্বাই পেঁচোকে দেখতে ছুটে এলো।

গাপ্পু ছড়া কাটলো—

বেশ হয়েছে বেশ হয়েছে
আম গাছেতেই থাক,
ঐ খানেই শুয়ে শুয়ে
পিসি পিসি ডাক।
যেমন তুমি শয়তানটা
তেমনি তুমি পাজী
তোমার জন্য দুঃখ তো নেই
হচ্ছে খুশি আজি।

গাছটা খুব দুলছিল বাতাসে তখনও, অনেক কাণ্ড করে, দু-তিন জন মিলে পেঁচোকে গাছ থেকে নামিয়ে আনলো। পেঁচোকে ঐ অবস্থায় দেখে পেঁচোর পিসি কপাল চাপড়ে কাঁদতে শুরু করলো। ধরাধরি করে

নিতুদের দাওয়ায় এনে শোওয়ানো হলো। পেঁচোর পিসি ঝাড়ফুঁক শুরু করলো।

পেঁচোর অবস্থা দেখে নিতু নিমু শিবে মেধো আর গাপ্পু খুব হাসতে লাগলো। গাপ্পু গিয়ে কানটা টেনে দিল, নিমু চুলগুলো ধরে এক হ্যাঁচকা মারলো, পেঁচোর পিসির ঝাড়ফুঁকে কিছুই সারলো না। অসুখটা কি যে সারবে? উঠেছিল চুরি করতে আমগাছে, উঠলো ঝড়, আর নামতে পারলো না। তার উপর গাছে ছিল বড় বড় বোলতা—এতক্ষণ ধরে খুব কামড়েছে। দেখছো না হাতমুখ ফুলে ঢোল, নিমুর বাবা বলল বেশ একটু চেঁচিয়ে। নিমুর মা বলল, নে যাও—নে যাও তোমার গুণধরকে, নিমপাতা ডলে লাগাও গে, সেরে যাবে। বুড়ি পেঁচোকে টানতে টানতে নিয়ে চলল। আর ছেলের দল হাততালি দিতে দিতে হাসতে লাগলো। শাঁকচুন্নি পিসিটা রাগে গরগর করতে করতে চলে গেল। কিন্তু সবার মনে একটু সন্দেহ লাগছিল, কি জানি, পেঁচোটাকে অন্য রকম কিছু কামড়ালো না তো? মুখ দিয়ে লালা ঝরছিল, চোখ দুটো ভীষণ লাল হয়ে উঠেছিল, নিতুর বাবার খুব দয়া মায়া, সে একবার সেই রাত্রেই নিমুর বাবাকে সঙ্গে নিয়ে পেঁচোকে গিয়ে দেখে এলো। দেখে এসে পাড়ায় বলল, না, পেঁচোকে বুড়ি বেশ ভালো ওষুধপালা দিয়ে ভালো করে তুলেছে—বুড়ি অনেক ওষুধপালা জানে। মরার ফাঁড়া কেটে গেছে, তবে বাছাধন খুব জব্দ হয়েছে, মাস খানেকের মধ্যে আর শয়তানি মারতে হবে না বাছাধনের।

হুঁ—মাস খানেক! তিন দিনও গেল না, ভরদুপুরে খেয়েদেয়ে নিতুর মা বাসন নিয়ে পুকুরে গেছে, দেখে কি একটা ঝোপের মধ্যে পেঁচো বসে আছে হাতে ছিপ নিয়ে।

নিতুর মা বলে উঠলো, হ্যাঁ রে হতচ্ছাড়া, তিন দিন আগে তো মরে যাচ্ছিলি, তবুও তোর শাস্তি হলো না? আবার এসেছিস পরের সর্বনাশ করতে? বেশ করব, তোর কিরে? বেশি কথা বলবি তো পুকুরে চুবিয়ে তুলবো। আর কথা বলার সাহস রইল না, শয়তানটা সব পারে। এমন

সময় কেউ কোথাও নেই, ঘাড় ধরে ডুবিয়ে ধরলেই হলো। তবু বলল, হতচ্ছাড়া ত বেআক্কেলে মামদো, ভূত, দূর হ এই পুকুর থেকে ? নিতুর মা বাসন মাজতে মাজতে দেখলো, তার কথাগুলোতে লজ্জা হওয়া দূরের কথা খ্যা খ্যা করে হাসতে লাগলো। রাগে গা জ্বলে গেল নিতুর মায়ের। টপাটপ মাছ তুলছে আর চুপড়ি বোঝাই করছে, ছিপের একটা টানও ব্যর্থ হচ্ছে না। দুঃখে বুকটা ফেটে যেতে চাইল নিতুর মায়ের। ওর জ্বালায় একটা মাছও কি খাবার উপায় আছে এত পয়সার মাছ ছেড়েও ? নিতুর মা বাসনের গোছা নিয়ে বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে গাপ্পুর মায়ের সঙ্গে দেখা, শুনেছ দিদি এমন আশ্চর্য কথা ?

কি কথা—কি কথা ? আর কি কথা ! আমাদের শ্বশুরকুলের ভিটে-মাটি ছাড়তে হবে ঐ পেঁচোর জ্বালায়। এই তিন দিন আগে বোলতার কামড় খেয়ে মরেই প্রায় যাচ্ছিল শয়তানটা। ভাবলুম, না মরুক, অন্তত ভুগুক চার-ছ মাস, আমাদেরও হাড় জুড়োক, আর ওরও আক্কেল হোক। হায় ভগবান, চার দিনও গেল না, দেখে এসো দিদি আমার পুকুরের সব কটা মাছ টপাটপ তুলছে আর চুবড়ি বোঝাই করছে। বলতে আমায় বলে কিনা পুকুরে ডুবিয়ে দেবো !

ভগবান, তুমি যদি থেকে থাক, বিহিত কর, তা না হলে গৃহস্থ বুঝি আর বাঁচে না। নিতুর মার কথা শুনে গাপ্পুর মা বুঝি বা বোবাই বনে গেল, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল নিতুর মার মুখের পানে।

তা ভগবানের শুনেছি কানও আছে চোখও আছে, প্রাণ দিয়ে ডাকলে নাকি তিনি সাড়া দেন, আর সময়মত তাঁর কৃপা কাজে লাগান। এতদিন পর তাই নিতুর মায়ের কথা কানে গিয়ে পৌঁছলো বুঝি, তাই ভেবেচিন্তে একটা বিহিত করলেন তিনি। আর চোখেও তো তিনি পেঁচোর কাণ্ডটা এতদিন ধরে দেখে আসছেন, সেজন্য একটা বিহিত তিনি করেই ফেললেন। ভরদুপুরে নিতুর মায়ের পুকুর থেকে এক চুবড়ি মাছ হাতে নিয়ে পেঁচো মহানন্দে গান গাইতে গাইতে চলেছিল ভূতুড়ে মাঠ পেরিয়ে। ভূতুড়ে মাঠ বলা হত একটা বাঁশবনের পাশের

মাঠটাকে, বেশ ছায়া ছায়া। বাঁশবনের পাশ দিয়ে চলেছিল পেঁচোটা। ওরই কাছে হোঁদলের বাড়ি, হোঁদল গাঁয়ের পিয়ন। দুপুরবেলা ডিউটি সেরে এসে দাওয়ায় বসে ভাত খাচ্ছিল, মা তাকে খেতে দিচ্ছিল। কাণ্ড-খানা পড়বি তো পড় ওর চোখেই পড়ে গেল। পেঁচো গলা ফাটিয়ে গান গাইতে গাইতে চলেছিল বেশ। এমন সময় হঠাৎ একটা ভীষণ শব্দ হলো—পোঁ···আর সঙ্গে সঙ্গে একটা লম্বা সরু বাঁশ এসে রাস্তায় পড়ে পেঁচোর পথ আটকালো। হঠাৎ আবার পোঁ···করে পেঁচোকে আর তার মাছের চুবড়ি নিয়ে কে যেন এক্কেবারে শূন্যে তুলে ফেলল। ভরদুপুর বেলা, কেউ কোথাও নেই। একমাত্র হোঁদলের চোখে পড়লো। হোঁদল ভীষণ ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠলো—গেল গেল গেল। কি গেল রে, কে গেল রে?—হোঁদলের মা প্রশ্ন করে ভয় পেয়ে। হোঁদল ভাত খাওয়া ফেলে রেখে হাতটা মুখটা ধুতে ধুতে বলে, ভূত, ভূত, পেঁচোকে টেনে নিল, আমি দেখলাম। বলতে বলতে ছুট লাগাল পেঁচোর পিসির বাড়ির দিকে। পথে গুপীর সঙ্গে দেখা। হোঁদলকে ছুটতে দেখে ঘাবড়ে গিয়ে চেঁচাতে থাকল, কি হলো রে হোঁদল, ছুটছিস কেন অত হন্তদন্ত হয়ে? ছুটতে ছুটতে হোঁদল চেঁচিয়ে বলে উঠলো, পেঁচোকে মেছোভূতে ধরেছে, ওধারে যাস নে গুপী। বলতে বলতে বেদম ছুট লাগালো হোঁদল। মোটাসোটা দেহটা ঘেমেঘুমে জল হয়ে গেল সজনেতলায় পৌঁছতে। হোঁদল উঠোনে পা দিয়েই বিকট চিৎকার করে উঠলো, ওগো পিসি, তোমার পেঁচোকে মেছোভূতে তুলে নিল, আমি নিজের চোখে দেখলাম। মাছের চুবড়ি নিয়ে ভূতুড়ে মাঠ পেরিয়ে চলেছিল কোথায়, এমন সময় পোঁ করে একটা বাঁশ পড়ল, পেঁচো বাঁশটা পার হতে যাবে, একটা ঠ্যাং বাড়িয়েছে যেমনি অমনি আবার পোঁ করে শব্দ করে তুলে নিল পেঁচোকে। দাওয়ায় বসে ভাত খেতে খেতে আমি সব দেখলাম। তাড়াতাড়ি এসো পিসি, তোমার পেঁচোকে যদি চাও। এতক্ষণে বোধহয় পেঁচোর ঘাড় মটকাচ্ছে মেছোভূতটা।

খবর শুনে হাউ মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে ছুটলো ওঝার বাড়ি।

তাকে নিয়ে ছুটতে ছুটতে এলো ভূতুড়ে মাঠের ধারে, বাঁশবনের পাশে। এদিকে গুপী চেঁচামেচি করে এমন সুখবরটা ছড়িয়ে সাত পাড়ার লোক জড়ো করে ফেলল ভূতুড়ে মাঠে। কেউ আর বাদ রইল না। ওঝা সরষে পুড়োতে লাগলো, আর মন্ত্র পড়তে লাগল। সারা দুপুরটা গেল, পেঁচোর দেখা নেই, সব্বাই তো ভেবেই রাখল পেঁচোকে এতক্ষণে মেছোভূতে সাবড়ে দিয়েছে। পেঁচোর পিসি তো কেঁদেই চলেছে বিলাপ করে, ওরে আমার পেঁচো রে, কোথায় গেলি রে বাপ, আয় রে আমার নন্দদুলাল। কেঁদে কেঁদে বুড়ির মুখ চোখ ফুলে ঢোল হলো। বেলা শেষ হয়-হয়। এমন সময় আবার সেই শব্দ, পোঁ…সবার চোখের সামনে পেঁচো পড়ল বাঁশসুদ্ধু ধপাস্ করে। হৈ চৈ পড়ে গেল পেঁচোকে দেখার জন্য। ওঝা ভূত ছাড়ালো বটে, কিন্তু পেঁচোর অবস্থা কাহিল, মুখ দিয়ে গ্যাঁজা উঠছে, চোখ দুটো পাথরের মতো শক্ত, মুখে চোখে জলের ঝাপটা পড়তে লাগল, ওঝা ভূতকে ছেড়ে পেঁচোর দিকে নজর দিল। পেঁচোর পিসি বলে উঠল, ওরে দেখ, ওর ধড়ে পেরানটা আছে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার পেঁচো কি মরার ছেলে? রীতিমতো সে ভূতের সঙ্গে লড়াই করেছে এতক্ষণ, এই দেখ না, একটা কান খুবলে নিয়েছে মেছোভূতটা। আবার পিসির কান্না, ওরে কি হবে মা, কান না থাকলে শুনতে পাবে কি করে গো? আরে চুপ কর, কান গেছে গেছে, কানের ফুটোটা তো আছে। বকে উঠল ওঝা।

জলের ঝাপটা খেয়ে পান পড়ার জল খেয়ে চোখ মেলল পেঁচো। হোঁদল খুব ভালো ছেলে, ঘরের থেকে বাটি করে দুধ এনে খাওয়ালো। পেঁচো এবার উঠে বসল।

কিন্তু যন্ত্রণা রইল কানের, রক্ত ঝরছে তখনও পেঁচোর কান থেকে। সন্ধ্যে হয়ে এলো; পেঁচোকে নিয়ে পিসি বাড়ির পথ ধরল, নিতু নিমু গাপ্পু হাততালি দিয়ে ছড়া কাটল—

পেঁচোকে নিল মেছোভূতে
খাম্‌চে নিল কান।

আমরা হলাম বেজায় খুশি
আনন্দে গাই গান।
জ্বলুক পুড়ুক কানটা পেঁচোর
হবেই তবে জব্দ।
চুপটি করে থাকবে ঘরে
করবে না আর শব্দ।

সত্যি পেঁচোটা সেই থেকে ভূতের ভয়ে একেবারে জব্দ হয়ে গেল, ঘর ছেড়ে কেউ নড়তে দেখে না ওকে। গাঁয়ের লোক শান্তি পেল।

ছুদিন হলো মিসেস স্মিথের পোষা আদরের কুকুরটি হারিয়েছে। ছেলে-পুলে নেই তার। ঐ কুকুর জিন্ই একমাত্র বুড়োবুড়ীর সম্বল। অবশ্য সারা ইংল্যাণ্ডেই নিরানব্বই ভাগ বাড়িতে কুকুর বেড়াল থাকবেই। কুকুর বেড়াল ওদের এত প্রিয়। ওদের দেশের কুকুর বেড়ালের খাবার দেখে অবাক লাগত আমার। বাজারে ওদের খাবারের আলাদা দোকান আছে। প্রথম দিন বাজারে গিয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। বিরাট হলটার এক পাশে বড় বড় করে লেখা 'ফুড অনলি ফর ডগ্স্ অ্যাণ্ড ক্যাটস', আর একপাশে লেখা 'ফুড ফর ব্রিটিশ বার্ডস'। ফুডের কৌটোগুলো প্যাকেটগুলো এত সুন্দর দেখতে মনে হয় নিজেরাই কিনে খেয়ে ফেলি। দেখতে দেখতে নিজের দেশের কথা মনে হতো। কুকুর বেড়ালগুলো যেন এক একটি ছোট হাতী। যত্নে আর খাওয়ায় ওদের দেহ এত সুন্দর হয় দেখতে, দারুণ ভালো লাগে। বুঝতেই পার, কুকুর হারানো ওদের কাছে কতখানি ছুঃখের। ছেলেপিলে হারালেও বোধহয় এতটা ছুঃখ পায় না, আমার মনে হয়।

যদিও ওদের প্রতিটি কুকুর ইনসিওর করা থাকে, তবুও হারায়। কিছুদিন হলো ইংলণ্ডের কোনো-কোনো জায়গায় কুকুর হারাবার খুব হুজুগ পড়েছে। মিসেস স্মিথ ভাবলেন, ছু দিন হয়ে গেল আজও যদি না পাওয়া যায় তবে পুলিসে খবর দিতে হবে। সন্ধ্যেবেলা মিসেস ও মিস্টার স্মিথ বসে কফি খাচ্ছিলেন এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলতেই দেখলেন পাশের পাড়ার মিসেস অ্যালেনের ছোট্ট ছেলে স্টেভ দাঁড়িয়ে। মিসেস স্মিথ কোনো কথা বলার আগেই স্টেভ বললো, 'আচ্ছা, শুনলুম আপনার জিন্ নাকি হারিয়েছে!' স্মিথ কাঁদ-কাঁদ স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ প্লীজ—যদি খুঁজে দিতে পার তাহলে…'

স্টেভ কোনো কথা না বলে পকেট থেকে ছোট্ট একটা হুইসিল বার করে বাজালো। সঙ্গে সঙ্গে উইলো গাছের আড়াল থেকে কুকুর জিন্‌কে নিয়ে বেরিয়ে এলো স্মিথের মুখচেনা ছেলেরা জন, ফ্র্যাঙ্ক আর চার্ল। দারুণ অবাক হলেও এবং ব্যাপারটি বুঝতে না পারলেও হারানো জিন্‌কে বুকে জড়িয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। বেরিয়ে এলেন মিস্টার স্মিথও। খুশি খুশি হাসি হেসে ধন্যবাদ জানালেন ক্ষুদে চোরদের। তারপরই পকেট থেকে একটা পাউণ্ড বার করে গুঁজে দিলেন স্টেভের হাতে। বুঝলেন স্টেভই দলপতি।

পাউণ্ডটা হাতে পেয়ে গা ঢাকা দিল স্টেভ সবাইকে নিয়ে। এইবার যাবে দোকানে। খাবে চকোলেট আর কেক। এরা মিষ্টি খায় দারুণ। সব সময় মুখে থাকে টফি, চকোলেট বা লজেন্স। এসব কিনতে তো পকেটমানির প্রয়োজন। মা বাবা লাঞ্চ ডিনার ছাড়া আর কিছুই দেয় না মধ্যবিত্ত ঘরে। সুতরাং পকেটমানি ওরা পাবে কোথায়? এই নয়-দশ বছর তো কোনো কাজও পাবে না। তাই কিছু ছেলে কুকুর লুকিয়ে রাখে, তারপর ঠিক এমনিভাবে এনে দেয়, পকেটমানির সমাধান হয়।

আর একটু বড় হলে কিন্তু করবে না, তবেই পুলিসের হাতে পড়বে। এই বয়সে এটাকে কেউই খুব একটা অন্যায় মনে করে না। তবে সবাই সাবধান হয়।

—